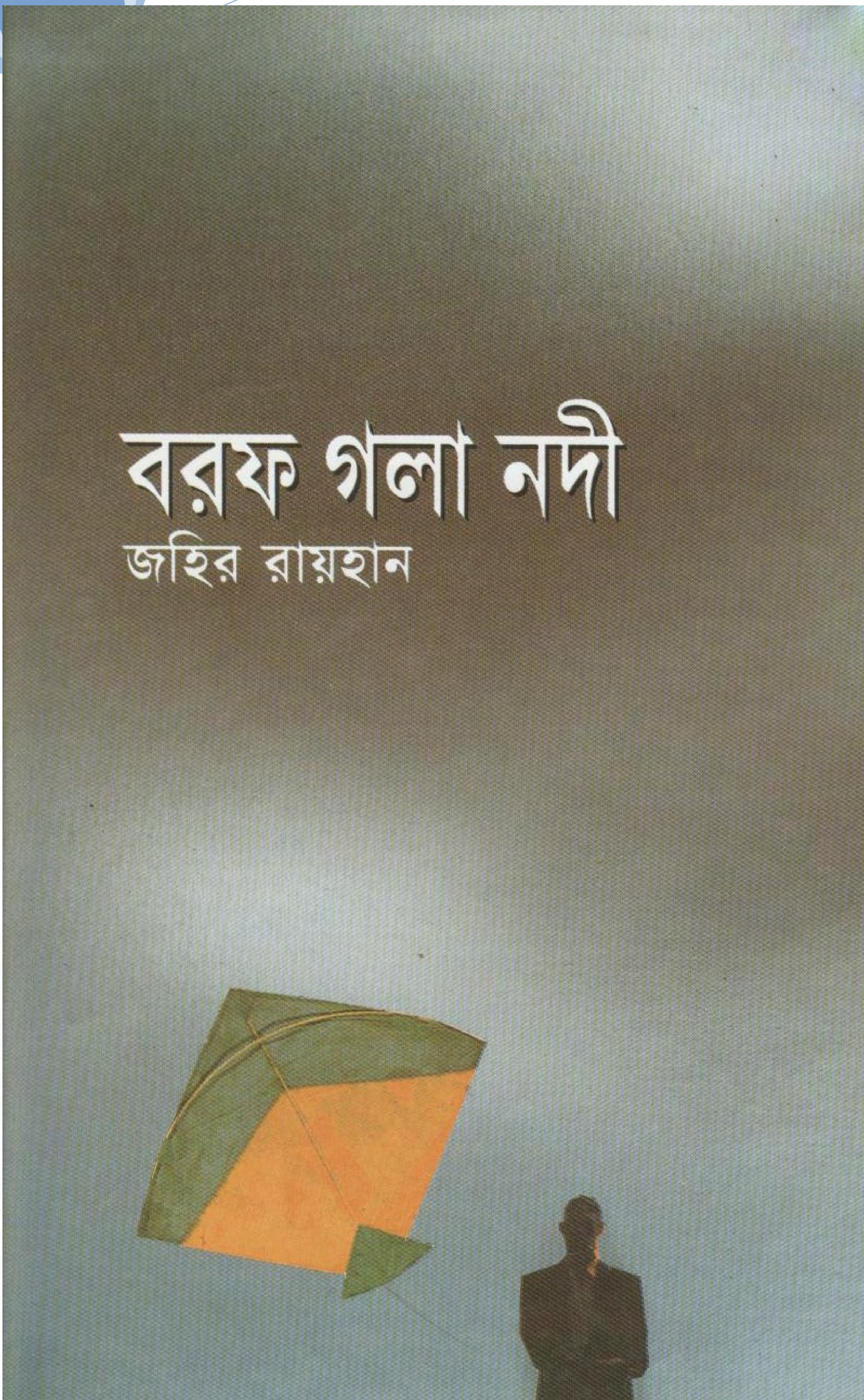
বরফ গলা নদী
জহির রায়হান

বরফ গলা নদী

জহির রায়হান

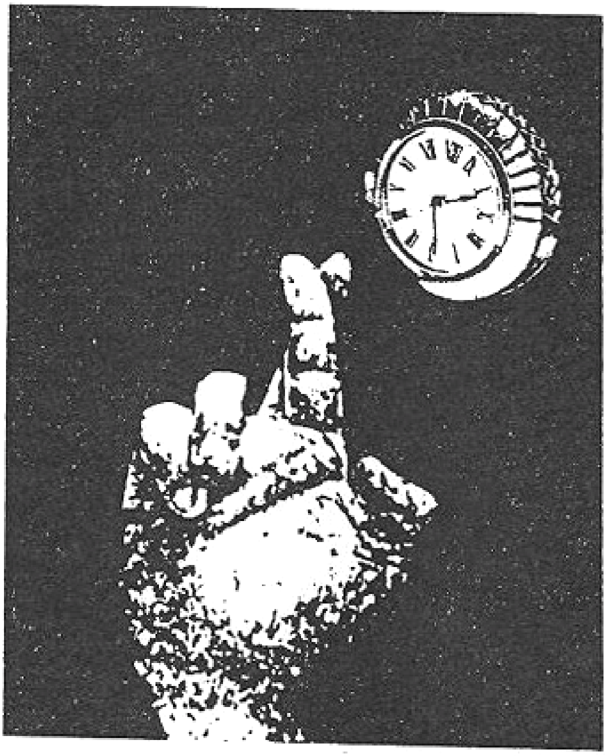

অনুপম প্রকাশনী

প্রকাশনার ২৬ বছর

প্রকাশক
মিলন নাথ
অনুপম প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

প্রথম অনুপম সংস্করণ
জানুয়ারি ১৯৯৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ
মে ২০০০
তৃতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৩

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
সূচনা কম্পিউটার্স
৪০/৪১ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
এস আর প্রিন্টিং প্রেস
৭ শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী লেন
ঢাকা-১১০০

মূল্য
৭০·০০ টাকা

ISBN 984-404-093-x

BOROF GALA NADI : A Bengali Novel by Zahir Raihan
Published by Milan Nath. Anupam Prakashani
38/4 Banglabazar Dhaka-1100

Price : Tk. 70.00 US$ 5.00 only

উৎসর্গ
কাইয়ুম চৌধুরী
বন্ধুবরেষু

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

- শেষ বিকেলের মেয়ে
- তৃষ্ণা
- হাজার বছর ধরে
- আরেক ফাল্গুন
- কয়েকটি মৃত্যু
- আর কত দিন
- একুশে ফেব্রুয়ারী
- গল্প সমগ্র
- উপন্যাস সমগ্র (সুদৃশ্য মোড়কে)
- উপন্যাস ও গল্প সমগ্র (সুদৃশ্য মোড়কে)
- প্রবন্ধ সমগ্র (প্রকাশিতব্য)
- চিত্রনাট্য সমগ্র (প্রকাশিতব্য)
- রচনা সমগ্র (প্রকাশিতব্য)

উপসংহারের আগে

উত্তরের জানালাটা ধীরে ধীরে খুলে দিলো লিলি। একঝলক দমকা বাতাস ছুটে এসে আলিঙ্গন করলো তাকে। শাড়ির আঁচলটা কাঁধ থেকে খসে পড়লো হাতের উপর। নিকষ কালো চুলগুলো ঢেউ খেলে গেলো। কানের দুলজোড়া দোলনের মতো দুলে উঠলো। নীলরঙের পর্দাটা দু-হাতে টেনে দিলো সে। তারপর বইয়ের ছোট আলমারিটার পাশে, যেখানে পরিপাটি করে বিছানো বিছানার ওপর দু-হাত মাথার নিচে দিয়ে মাহমুদ নীরবে শুয়ে, সেখানে এসে দাঁড়ালো লিলি। আস্তে করে বসলো তার পাশে। ওর দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে মাহমুদ বলল, আমি যদি মারা যেতাম তাহলে তুমি কী করতে লিলি ?

আবার সে কথা ভাবছো ? ওর কণ্ঠে ধমকের সুর।

মাহমুদ আবার বলল, বলো না, তুমি কী করতে ?

কাঁদতাম। হলো তো ? একটু নড়েচড়ে বসলো লিলি। হাত বাড়িয়ে মাহমুদের চোখজোড়া বন্ধ করে দিয়ে বলল, তুমি ঘুমোও। প্লিজ ঘুমোও এবার। নইলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে যে। আজ ক-রাত ঘুমোওনি সে খেয়াল আছে ?

মাহমুদ মুখের ওপর থেকে হাতখানা সরিয়ে দিলো ওর, কী বললে, লিলি ! তুমি কাঁদতে তাই না ?

না, কাঁদবো কেন, হাসতাম। কপট রাগে মুখ কালো করলো লিলি। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পাকঘরের দিকে চলে গেলো সে। মাহমুদ নাম ধরে বারকয়েক ডাকলো, কিন্তু কোনো সাড়া পেলো না। পাকঘর থেকে থালা-বাসন নাড়ার শব্দ শোনা গেলো। বোধ হয় চুলোয় আঁচ দিতে গেছে লিলি।

চোখজোড়া বন্ধ করে ঘুমোতে চেষ্টা করলো সে। ঘুম এলো না। বারবার সেই ভয়াবহ ছবিটা ভেসে উঠতে লাগলো ওর স্মৃতির পর্দায়। যেন সবকিছু দেখতে পাচ্ছে সে। সবার গলার স্বর শুনতে পাচ্ছে। মা ডাকছেন তাকে—মাহমুদ বাবা, বেলা হয়ে গেলো। বাজারটা করে আন তাড়াতাড়ি।

চমকে উঠে চোখ মেলে তাকালো সে। সমস্ত শরীর শিরশির করে কাঁপছে তার। বুকটা দুরুদুরু করছে। ভয় পেয়েছে মাহমুদ। তবু আশেপাশে একবার তাকালো সে। মাকে যদি দেখা যায়। কিন্তু কেউ তার নজরে এলো না। এলো একটা আরশুলা, বইয়ের আলমারিটার ওপর নিশ্চিন্তে হেঁটে বেড়াচ্ছে সেটা। তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল মাহমুদ।

একটু পরে পাকঘর থেকে একগ্লাস গরম দুধ হাতে নিয়ে এ ঘরে এলো লিলি। ওকে দেখতে পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হলো মাহমুদ। একটুকাল নীরব থেকে বললো, আমি মরলাম না কেন, বলতে পারো লিলি ?

সে কোনো জবাব দিলো না। বিছানার পাশে গোল টিপয়টার ওপর গ্লাসটা নামিয়ে রাখল।

মাহমুদ আবার জিজ্ঞাসা করলো, কই আমার কথার জবাব দিলে না তো ?

লিলি বললো, দুধটা খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

কী প্রশ্ন ?

আমি মরলাম না কেন ?

লিলি ফিক করে হেসে দিয়ে বলল, আমার জন্যে। বলে আবার গম্ভীর হয়ে গেলো সে। দুধের গ্লাসটা ওর মুখের কাছে এগিয়ে ধরে বলল, নাও দুধটা খেয়ে নাও।

কয়েক ঢোক খেয়ে মাহমুদ সরিয়ে দিলো গ্লাসটা, আমার বমি আসছে।

লেবু দেবো ? সামনে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলো লিলি।

মাহমুদ মাথা নাড়লো, না।

লিলি ওর চুলের ভেতর হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, বড় বেশি চিন্তা করো তুমি, ওসব ভেবে কি কোনো কূল-কিনারা পাবে ? এখন ঘুমোও, লক্ষীটি।

ধীরে ধীরে চোখ বুজলো মাহমুদ।

একটু পরে ঘুমিয়ে পড়লো সে। ওর হাতখানা কোলের ওপর থেকে নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে উঠে পড়লো লিলি। কলগোড়ায় গিয়ে হাতমুখ ধুলো। পা টিপে টিপে ঘরে এসে আলনা থেকে তোয়ালেটা নামিয়ে নিয়ে মুখ মুছলো। আয়নাটা সামনে রেখে ঘন কালো চুলগুলো আঁচড়ে নিলো। পরনের শাড়িটার দিকে একবার তাকালো সে। না, এতেই চলবে। বাইরে বেরুবার আগখান দিয়ে একবার এসে নিঃশব্দে মাহমুদকে দেখে গেলো লিলি। তারপর টেবিলের ওপর থেকে তালাটা তুলে নিয়ে হালকা পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। বাইরে থেকে তালাটা বন্ধ করে দিলো দরজায়। টেনে দেখলো ভালোভাবে লেগেছে কিনা। তারপর চাবিটা ব্যাগের মধ্যে রেখে দিয়ে রাস্তায় নেমে এলো লিলি। কাছাকাছি কোনো রিকশা চোখে পড়লো না।

আশেপাশে কোনো রিকশাস্ট্যান্ডও নেই। বেশ কিছুদূর হেঁটে গিয়ে তারপর পাওয়া যেতে পারে একটা।

ব্যাগটা খুলে, পয়সা নিয়েছে কিনা দেখলো লিলি। নিয়েছে সে। কিছু খুচরো আর দুটো একটাকার নোট।

এই দুপুর-রোদে বেশিদূর হাঁটতে হলো না। খানিক পথ আসতে একটি রিকশা পাওয়া গেলো। হাত বাড়িয়ে তাকে থামালো লিলি, ভাড়া যাবে ? আজিমপুর গোরস্থানে যাবে। কত নেবে ?

আট আনা, মেমসাব।

কোনো দ্বিরুক্তি না করে রিকশায় উঠে বসলো লিলি।

বিকেলে বাসায় ফিরে এসে তালাটা খুলতে গিয়ে হাত কাঁপছিলো তার। সাবধানে দরজাটা খুললো। এখনো ঘুমুচ্ছে মাহমুদ। কপালে মৃদু ঘাম জমেছে তার! কাছে এসে শাড়ির আঁচল দিয়ে সস্নেহে তার কপালটা মুছে দিলো সে। তারপর অতি ধীরে ধীরে নিজের মুখখানা নামিয়ে এনে ওর মুখের উপর রাখলো লিলি। গভীর আবেগে অস্পষ্ট স্বরে বলল, এর বেশিকিছু আমি চাইনে তোমার কাছে। চিরদিন এমনি করে যেন তোমাকে পাই।

মাহমুদ নড়েচড়ে উঠে ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করে বললো, মরলে মানুষ কোথায় যায় লিলি ?

লিলি মুখ তুলে সভয়ে তাকালো ওর দিকে। ঘুমের মধ্যেও সেই একই চিন্তা করছে লোকটা। দিনে-রাতে এভাবে যদি মৃত্যুর কথা ভাবতে থাকে, তাহলে হয়তো একদিন

পাগল হয়ে যাবে মাহমুদ। না, তার সেই ভয়াবহ পরিণতির কথা কল্পনা করতে পারে না লিলি। এ পরিণাম প্রতিহত করতেই হবে। ভালোবাসার বাঁধ দিয়ে ধ্বংসের প্লাবন রোধ করবে সে।

বিছানার পাশে বসে অনেকক্ষণ তার গায়ে, মাথায়, মুখে হাত বুলিয়ে দিলো লিলি। যেন হাতের স্পর্শে হৃদয়ের সকল ব্যথা আর সমস্ত যন্ত্রণার উপশম করে দিতে পারবে। তার ভেতরে বেদনার সামান্য চিহ্নটিও থাকতে দেবে না লিলি।

থাকবে শুধু আনন্দ। অনাবিল হাসি। তৃপ্তিভরা শান্তস্নিগ্ধ সুন্দর জীবন। যেখানে অশ্রু নেই। বিচ্ছেদ নেই। হাহাকার নেই। প্রেম প্রীতি আর ভালোবাসার একচ্ছত্র আধিপত্য সেখানে।

লিলি ভাবছিলো।

দুয়ারে মৃদু কড়া-নাড়ার শব্দে উঠে দাঁড়ালো সে। সাবধানে দরজাটা খুলতেই দেখলো মনসুর দাঁড়িয়ে।

উনি এখন কেমন আছেন ? ভেতরে এসে মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলো মনসুর।

লিলি চাপা কণ্ঠে বললো, ভালো। ঘুমুচ্ছেন দেখছি। বিছানার কাছে এসে দাঁড়িলো মনসুর, কখন ঘুমিয়েছেন ?

অনেকক্ষণ হলো। মাহমুদের গায়ের কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে লিলি বলল, আপনি দাঁড়িয়ে কেন, বসুন না।

মনসুর বলল, না, এখন বসবো না। উনি কেমন আছেন দেখতে এসেছিলাম। কাল সকালে আবার আসবো আমি। রাতে অবস্থা যদি খারাপের দিকে যায় তাহলে আমাকে খবর দেবেন।

আচ্ছা। লিলি ঘাড় নেড়ে সায় দিলো।

যাবার আগে, টাকাপয়সার কোনো প্রয়োজন আছে কিনা জানতে চাইলো মনসুর।

লিলি সংক্ষেপে বলল, না।

প্রয়োজন হলে সঙ্কোচ না করে চাইবেন, লিলির চোখে চোখ রেখে মনসুর কাতরকণ্ঠে বলল, দয়া করে আমাকে পর ভাববেন না।

না না, সে কী কথা। দ্রুত মাথা নেড়ে লিলি বললো ওকে, প্লিজ ভুল বুঝবেন না আপনি।

মনসুর চলে গেলে আবার বিছানার পাশে এসে বসলো লিলি।

ছোট শিশুর মতো ঘুমুচ্ছে মাহমুদ। নির্লিপ্ত প্রশান্তির কোলে আত্মসমাহিত সে। ভবিষ্যতের দিনগুলো এমনি কাটুক।

অর্থের প্রাচুর্য সে চায় না। এই ছোট্ট ঘরে, নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের আলিঙ্গনে নির্বাক প্রবাহে কেটে যাক দিন। এই শুধু তার চাওয়া। কিন্তু এ যেন একটা অতি সুন্দর কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। লিলি ভাবে মাহমুদের সঙ্গে বিয়ে হলে পর, এই-যে একটা অনাবিল জীবনের কথা ভাবছে সে, সে-জীবন কি বাস্তবে রূপায়িত হবে ?

তবু মানুষ তাই চায়।

লিলিও চাইছে।

কে জানে, মরিয়মও হয়তো তাই চেয়েছিলো।

আর সেই দুষ্টু মেয়ে হাসিনা। সেও কি এমন অন্ধকার ঘন সন্ধ্যায় বসে, এমনি কোনো কল্পনার জাল বুনেছিলো ?

তারও আগে যা ঘটেছিলো

সরু গলিটা জুড়ে ধীরে ধীরে এগুতে লাগল রিকশাটা। কিছুদূর এলে, মরিয়ম বলল, এবার নামতে হবে লিলি। সামনে আর রিকশা যাবে না। বলতে বলতে রিকশা থেকে নেমে পড়ল সে। তার পিছুপিছু লিলিও নামলো নিচে।

চারপাশে নোংরা আবর্জনা ছড়ানো। কলার খোসা, মাছের আমিষ, মরা ইঁদুর, বাচ্চা ছেলেমেয়েদের পায়খানা— সব মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। দুর্গন্ধে এক-মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

আঁচলে নাক ঢেকে লিলি বললো, আর কতদূর ?

এইতো আর অল্প-একটু— বলে সামনে হাত দিয়ে দেখালো মরিয়ম।

এদিকে গলিটা আরো সরু হয়ে গেছে। একজনের বেশি লোক পাশাপাশি হেঁটে যেতে পারে না। মরিয়ম আগে আগে লিলিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। নাকে ওর শাড়ি দিতে হয়নি, রোজ দু-বেলা এ পথে আসা-যাওয়া করতে করতে এসব দুর্গন্ধ ওর নাক-সহ্য হয়ে গেছে। আরো খানিকটা পথ পায়ে হেঁটে এসে একটা আস্তর-ওঠা লাল দালানের সামনে দাঁড়ালো মরিয়ম।

লিলি বলল, এটা বুঝি তোমাদের বাসা ?

মরিয়ম মাথা নেড়ে সায় দিলো, হ্যাঁ।

দোরগোড়ার একটা নেড়ি কুকুর বসে বসে গা চুলকাচ্ছিল।

ওদের দেখে একপাশে সরে গেল সে। এতক্ষণে নাকের ওপর চেপে- রাখা আঁচলটা নামিয়ে নিলো লিলি।

দরজাটা পেরুলে একটা সরু বারান্দা। দু-পাশে দুটো কামরা। একটিতে মাহমুদ থাকে। আরেকটিতে মরিয়ম আর হাসিনা। বারান্দার শেষপ্রান্তে আরো একটি কামরা আছে। ওটাতে মা আর বাবা থাকেন। দুলু আর খোকনও থাকে ওখানে। মা-বাবার কামরার ভেতর দিয়ে যেতে হয়। অন্য কোনো পথ নেই।

ভেতরে ঢুকে চারপাশে তাকিয়ে দেখছিলো লিলি।

মরিয়ম বললো, এসো।

ওর নিজের কামরাটায় লিলিকে এনে বসালো মরিয়ম।

একপাশে চওড়া একখানা চৌকির ওপর বিছানা পাতা। দুটো বালিশ পাশাপাশি সাজানো। একটা হাসিনার, আরেকটা মরিয়মের। দেয়ালে ঝোলানো আলনার সাথে তাদের কাপড়গুলো সুন্দর করে গোছানো। তার নিচে একটা কেরোসিন কাঠের টেবিল। টেবিলে বই-খাতা রাখা। আর কোনো আসবাব নেই ঘরে। আছে একটা মাদুর। ওটা মেঝেতে বিছিয়ে পড়ে ওরা।

বিছানার ওপর এসে বসলো লিলি, এটা বুঝি তোমার ঘর ?

হাতের বই-খাতাগুলো টেবিলের ওপর রেখে মরিয়ম জবাব দিলো— হ্যাঁ, হাসিনা আর আমি থাকি এখানে।

এ ঘরে অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে দুলু এসে উঁকি মারছিল ভেতরে। ওকে দেখে মরিয়ম বলল, দুলু, মা কোথায় রে ?

দুলু ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, পাকঘরে।

মরিয়ম বলল, আমার ছোট বোন দুলু। সবার ছোট ও।

লিলি কাছে ডাকলো তাকে, এসো এদিকে এসো।

ওর ডাক শুনে গুটিগুটি পায়ে পিছিয়ে গেলো দুলু। তারপর ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে গেলো সে।

মরিয়ম বলল, তুমি বসো লিলি, আমি এক্ষুনি আসছি। বলে আলনা থেকে গামছাটা নামিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলো সে।

মায়ের ঘরটা খালি। বাবা অফিস থেকে ফেরেননি এখনো। খোকন আর হাসিনা স্কুলে। মাহমুদ বোধ হয় এখনো ঘুমুচ্ছে ওর ঘরে। সারারাত ডিউটি দিয়ে এসে সারাদিন ঘুমোয় ও।

কুয়ো থেকে একবালতি পানি তুলে, মুখ হাত ধোবার জন্যে কাপড়টা গুটিয়ে নিয়ে ভালো করে বসলো মরিয়ম।

পাকঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে মা শুধোলেন, কে এসেছে রে মরিয়ম?

মরিয়ম মুখে পানি ছিটোতে ছিটোতে জবাব দিলো, আমার এক বান্ধবী।

মা জানতে চাইলেন, একসঙ্গে পড়তো বুঝি?

মরিয়ম বললো, হ্যাঁ।

মা আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। ভাতগুলো মজে এসেছে, এখনি নামিয়ে ফেন ঢালতে হবে। তারপর জলের কড়াটা চড়িয়ে দিতে হবে চুলোর উপর।

মরিয়ম পাকঘরে এসে ঝুঁকে পড়ে বলল, এককাপ চা দিতে পারবে, মা?

সালেহা বিবি বললেন, দেখি চা-পাতা আছে কিনা। বলে চুলোর পেছনে রাখা কৌটাগুলোর দিকে হাত বাড়ালেন তিনি। অনেকগুলো কৌটা রাখা আছে সেখানে। কোনোটাতে মরিচ, কোনোটায় হলুদ রসুন কিংবা পেঁয়াজ। মাঝখান থেকে একটা তুলে নিয়ে খুলে দেখলেন সালেহা বিবি। তারপর বললেন, দু-কাপ আন্দাজ আছে, তুই যা, আমি করে পাঠিয়ে দিচ্ছি। হঠাৎ কী মনে হতে পেছন থেকে তাকে আবার ডাকলেন সালেহা বিবি, শুধু চা দেবো?

কিছু আছে কি? মরিয়ম প্রশ্ন করলো, থাকলে দাও।

মা ঘাড় নাড়লেন, নেই। থাকবার কি উপায় আছে ওই দুলু আর খোকনটার জন্যে। কাল মাহমুদ কিছু বিস্কুট এনেছিলো, সাধ্য কি যে লুকিয়ে রাখবো, আজ সকালে বের করে দুজনে খেয়ে ফেলেছে।

যদি পারো, বাইরে থেকে কিছু আনিয়ে দিয়ো মা। যাবার সময় বলে গেলো মরিয়ম। মা-র ঘর থেকে সে শুনতে পেলো, ও-ঘরে কারো সঙ্গে কথা বলছে লিলি। বোধহয় হাসিনা ফিরেছে স্কুল থেকে। বাংলাবাজারে পড়ে সে ক্লাশ এইটে। লম্বা দোহারা গড়ন। রংটা শ্যামলা। সরু নাক। মুখটা একটু লম্বাটে ধরনের। বাড়ির অন্য সবার চেয়ে চেহারা একটু ভিন্নরকমের ওর। চোখজোড়া বড় হলেও তার মনিগুলো কটা কটা। বাঁ চোখের নিচে একটা সরু কাটা দাগ। ছোটবেলায় দৌড়ঝাঁপ করতে গিয়ে বটির উপর পড়ে কেটে গিয়েছিলো। সে চিহ্নটা এখনো মুছে যায়নি।

এ ঘরে এসে মরিয়ম দেখলো, লিলির পাশে বসে গল্প জমিয়েছে হাসিনা। আপনার শাড়িটা কত দিয়ে কিনেছেন?

লিলি বলল, মনে নেই, বোধ হয় আঠারো টাকা।
হাসিনা বলল, কী সুন্দর, আমিও কিনবো একখানা। কোত্থেকে কিনেছেন আপনি?
লিলি জবাব দিলো, নিউমার্কেট থেকে।
হাসিনা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে শাড়িটা দেখতে লাগলো। ওর এই স্বভাব— কারো পরনে একটা ভালো শাড়ি কিংবা ব্লাউজ দেখলে অমনি তার দাম এবং প্রাপ্তিস্থান জানতে এবং সেটা কেনার জন্য বায়না ধরবে। কিনে না দিলে কেঁদেকেটে একাকার করবে। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ রাখবে হাসিনা। মরিয়ম এসে বললো, ওর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে কি লিলি, ও আমার ছোট বোন হাসিনা।
লিলি হেসে বললো, নতুন করে আর পরিচয় দিতে হবে না, ও নিজেই আলাপ করে নিয়েছে।
হাসিনা বললো, আপার কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি। বলে হঠাৎ কী মনে হতে ওর দিকে ঘুরে বসে সে আবার বলল, আচ্ছা আপনি বলুন তো, আপা সুন্দর না আমি সুন্দর। ওর প্রশ্ন শুনে হেসে দিলো লিলি। মরিয়ম বললো, নতুন কেউ এলেই ওই এক প্রশ্ন ওর— আপা সুন্দর, না আমি সুন্দর।
ক-দিন বলেছি তুমি সুন্দর, তুমি সুন্দর, আমি কুৎসিত, হলো তো?
গলার স্বর শুনে মনে হলো ও রাগ করেছে। আসলে মনে মনে হাসছে মরিয়ম, কারণ সে জানে যে হাসিনার চেয়ে ও অনেক বেশি সুন্দর। রঙটা ওর ফরসা ধবধবে। মায়ের দেহ-লাবণ্যের উত্তরাধিকারী হয়েছে সে। চেহারাটা মায়ের মতো সুশ্রী। আর চোখজোড়া খুব বড় না হলেও হাসিনার মতো কটা নয়।
মা বলেন, ও ঠিক আমার মতো হয়েছে, স্বভাবও আমারই পেয়েছে সে, আর তোরা হয়েছিস তোদের বাবার মতো ছন্নছাড়া।
এ নিয়ে রোজ রোজ মায়ের সঙ্গে ঝগড়া বাধায় হাসিনা। বলে, তুমিতো সব সময় ওর প্রশংসাই করো, আমরা যেন কিছু না।
শুনে মা হাসেন।
লিলিও হাসলো আজ। হেসে বললো, মরিয়ম ঠিকই বলেছে। ও দেখতে কুৎসিত। তুমি ওর চেয়ে অনেক সুন্দর হাসিনা।
শুনেই হাসিনা বড় খুশি হলো।
লিকলিকে বেণিজোড়া দুলিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। বলল, আপনি বসুন। আমি এক্ষুনি আপনার জন্যে চা বানিয়ে আনছি। বলে ঘর থেকে বেরুতে যাবে এমন সময়-বারান্দায় মাহমুদের তীক্ষ্ণ গলা শোনা গেলো— কদিন বলেছি আমার বইপত্র ঘাঁটাঘাটি করিসনে, তবু রোজ তাই করবি। এরপরে আমি তোকে মাথার ওপরে তুলে আছাড় মারবো হাসিনা।
হাসিনার খোঁজে এ ঘরে এসে মুহূর্তে চুপসে গেল মাহমুদ। লিলির দিকে অপ্রস্তুত দৃষ্টি মেলে ক্ষণকাল তাকিয়ে রইলো সে। তারপর যেমন হন্তদন্ত হয়ে এসেছিলো, তেমনি দ্রুত বেরিয়ে গেলো।
ও চলে যেতে আঁচলে মুখ চেপে ঘরময় দ্রুত লুটোপুটি খেলো হাসিনা। মরিয়ম ধমকের সুরে বললো, আবার হাসছে দেখনা, লজ্জা-শরম বলে কিছু যদি থাকতো। কদিন দাদা নিষেধ করে দিয়েছে ওর বইপত্র না ঘাঁটতে তবু—কথাটা শেষ করলো না মরিয়ম।

একদিন মাহমুদের বই ঘাঁটতে গিয়ে একটা একটাকার নোট পেয়েছিল হাসিনা। আরেকদিন একটা আটআনি। সেদিন থেকে যখনি মাহমুদ বাইরে বেরিয়ে যায় তখনি ওর বইপত্র ওলটায় গিয়ে সে। মরিয়মের ধমক খেয়ে চুপ করে গেলো হাসিনা। পরক্ষণে কী মনে হতে লিলির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো, আপনার ক্যামেরা আছে লিলি আপা?

লিলি বললো, কেন, ক্যামেরা দিয়ে কী করবে তুমি?

হাসিনা বলল, ছবি তুলবো।

তাই নাকি? লিলি মৃদু হেসে বলল, না ভাই। ক্যামেরা আমার নেই।

বিমর্ষ হয়ে লিলির জন্যে চা আনতে গেলো হাসিনা।

একটা পিরিচে দুটো সন্দেশ আর দুটো রসগোল্লা। পাশে রাখা দু-কাপ গরম চা। দেখে চোখজোড়া বিস্ফারিত হলো হাসিনার। নাচের তালে জোর ঘুরনী দিয়ে টুপ করে বসে পড়লো সে, মা আমি একটা খাবো। একমুহূর্তও দেরি না করে পিরিচ থেকে একটা রসগোল্লা তুলে নিয়ে মুখে দিলো সে।

সালেহা বিবি, কড়াইতে পানি ঢেলে ডাল চড়াচ্ছিলেন, পিছনে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি— ওকি হচ্ছে, ওকি হচ্ছে হাসিনা।

রসগোল্লাটা গিলে ফেলে হাসিনা বলল, অমন করছো কেন, একটাতো খেয়েছি, আরো তিনটে আছে।

সালেহা বিবির ইচ্ছে হলো চুলের গোছা ধরে মুখে একটা চড় বসিয়ে দিতে ওর, শুধু তিনটে মেহমানের সামনে কেমন করে দেয়, অ্যাঁ। তোদের নিয়ে আর পারিনে আমি। খাওয়ার জন্য এত হা-হা কেন তোদের, রসগোল্লা কি দেখিসনি জীবনে?

মায়ের ভর্ৎসনা শুনে মুখ কালো করলো হাসিনা। চোখজোড়া ছলছল করে উঠলো ওর। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমায় যে তুমি দেখতে পারো না তা আমি জানি। আপার মেহমান এসেছে বলে আজ মিষ্টি আনিয়েছো। আমার কেউ এলে, এককাপ চা-ও দিতে না।

আঁচলে চোখ মুছে ধুপধাপ শব্দ তুলে বেরিয়ে গেলো সে। এখন ছাতে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে হাসিনা।

শুধু একটা সন্দেশ খেলো লিলি।

দুলু এসে উঁকি দিচ্ছিলো দোরগোড়ায়। তার হাতে একটা সন্দেশ তুলে দিলো সে। অবশিষ্ট একটা রসগোল্লা পড়ে রইলো প্লেটের ওপর। সালেহা বিবি অনুরোধ করলেন— কি, হাত তুলে বসে রইলে যে! ওটা খেয়ে নাও।

লিলি বলল, না আর খাবো না। মিষ্টি বেশি খাইনে আমি। মরিয়ম তুমি খাও। হাসিনা গেলো কোথায়?

মরিয়ম কিছু বলার আগে সালেহা বিবি জবাব দিলেন, কোথায় আবার! ছাতে গিয়ে দৌড়ঝাঁপ দিচ্ছে। বলে আর সেখানে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করলেন না তিনি। চুলোর ওপর ডাল চড়িয়ে এসেছেন সে কথা মনে পড়তে দুলুর হাত ধরে বেরিয়ে গেলেন সালেহা বিবি। দুলুর চোখজোড়া তখনো পিরিচের অসহায়ভাবে পড়ে-থাকা রসগোল্লাটার দিকে নিবদ্ধ ছিলো। যাবার পথেও বার-কয়েক সেদিকে তাকিয়ে গেলো সে।

শহরে সন্ধ্যা নামার অনেক আগে এখানে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। বাইরে যখন বিকেল, এ গলিতে তখন রাত। আর বাইরে যখন ভোর হয়, তখনো এ গলিতে তমিস্রায়

ঢাকা থাকে। অনেক বাধা ডিঙ্গিয়ে, অনেক প্রাসাদের চূড়ো পেরিয়ে তবে এখানে প্রবেশের অধিকার পায় সূর্য। এ-পাড়ার বাসিন্দাদের বড় সাধনার ধন সে। তাই বেলা দুপুরে যখন একচিলতে রোদ এসে পড়ে এই হীন দালানগুলোর ওপর, তখন তার বাসিন্দারা বড় চঞ্চল হয়ে ওঠে। ভিজে কাপড়-চোপড়গুলো রোদে বিছিয়ে দেয় তারা। খানিক পরে ধীরে ধীরে আবার সূর্যটা পশ্চিমে নেমে যায়। কে যেন জোর করে টেনে নিয়ে যায় তাকে। তখন এখানে অন্ধকার। অন্ধকার শুধু। বাইরে চোখ পড়তে লিলি বলল, চলো এবার ওঠা যাক মরিয়ম, রাত হয়ে এলো। মরিয়ম বলল, একটু বসো। মাকে বলে আসি।

গলির মাথায় এসে লিলিকে বিদায় দিলো মরিয়ম। ও বাসায় যাবে এখন। মরিয়ম যাবে নারিন্দায় ছাত্রী পড়াতে। রিকশায় উঠে লিলি বলল, কাল আবার দেখা হবে ম্যারি। আদর করে মাঝে মাঝে মরিয়মকে ম্যারি বলে সম্বোধন করে সে।

ও চলে গেলে কিছুক্ষণ ওদিকে তাকিয়ে রইল মরিয়ম। তারপর মাথার ওপরের কাপড়টা আরো একটু টেনে দিয়ে রাস্তার পাশ ধরে এগিয়ে গেলো সে।

রোজ পায়ে হেঁটে ছাত্রীর বাড়ি যায় মরিয়ম।

পায়ে হেঁটে ফিরে আসে।

রিকশায় যদি আসা-যাওয়া করে তাহলে হিসেব করে দেখেছে, সে যা পায় তার অর্ধেকটা ব্যয় হয়ে যায়। তাছাড়া হাঁটতে যে খারাপ লাগে ওর তা নয়। মাসের শেষে ত্রিশটা টাকা পাওয়ার আনন্দ হাঁটার ক্লান্তির চেয়ে অনেক বেশি, অনেক সুখপ্রদ।

দু-পাশের দোকানপাট, লোকজন দেখতে দেখতে এমনি পায়ে চলার পথে অনেক কিছু ভাবে মরিয়ম। বাবার কথা। মায়ের কথা। মাহমুদের কথা। আর জীবনের ঘটে যাওয়া সেই বিপর্যয়ের কথা। অনেক কিছু ভাবে মরিয়ম। ইদানীং সেলিনার বড় বোনের দেবর মনসুরের কথাও মাঝে মাঝে ভাবনার মধ্যে এসে যায়। সেলিনা ওর ছাত্রীর নাম।

মনসুর আজকাল বড় বেশি আসা-যাওয়া করছে ওদের বাসায়। প্রায় বিকেলেই আসে। বিশেষ করে মরিয়ম যখন সেলিনাকে পড়াতে যায় তখন। মরিয়ম ভাবে, এবার থেকে লোকটা এলে তার সাথে আর কথা বলবে না সে। কে জানে মনে কী আছে লোকটার। কোনো বদ উদ্দেশ্যও তো থাকতে পারে। মানুষের খবর জানা সহজ নয়। জাহেদকে কত কাছ থেকে দেখেছিলো মরিয়ম, তবুও কি তার মনের গোপন কথাটি জানতে পেরেছিলো কোনোদিন ? যদি একমুহূর্ত আগেও জানতে পারতো তাহলে এমন একটা বিপর্যয় ঘটতে দিতো না মরিয়ম।

দোরগোড়ায় পা দিতেই ভেতরে মনসুরের গলার স্বর শোনা গেল।

আজ আগে থেকেই এসে বসে আছে লোকটা।

ওর সামনে দিয়ে নিঃশব্দে ভেতরে চলে এলো মরিয়ম।

সোজা সেলিনার ঘরে।

ওর ঘরটা বড় সুন্দর করে সাজানো আর বেশ পরিপাটি। একপাশে নতুন কেনা একখানা খাটের উপর সেলিনার বিছানা। নীলরঙের একখানা বেডকভার দিয়ে ঢাকা। মাথার কাছে একটা গোল টিপয়, তার ওপর ফুলদানিতে বহুবর্ণের ফুল সাজানো। দেখে মনে হয় তাজা ফুল। আসলে কাগজের তৈরী। দেয়ালে কয়েকখানা ছবি টাঙানো। কোনো এক শিল্পীর আঁকা একখানা পোর্ট্রেট।

এ ঘরে ছিল না সেলিনা। খবর পেয়ে এসে কপালে হাতের তালু ঠেকিয়ে বলল, আজ পড়বো না আপা, শরীরটা ভালো লাগছে না।

মরিয়ম সহানুভূতির সাথে বলল, কী হয়েছে?

ধপ করে বিছানার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে সেলিনা জবাব দিলো, মাথাটা ভীষণ ধরেছে আপা।

মরিয়ম জানে ওটা মিথ্যে কথা। যেদিন পড়ায় ফাঁকি দেবার ইচ্ছে থাকে সেদিন একটা-কিছু ছুতো বের করে বসে সেলিনা। কোনোদিন মাথাব্যথা। কোনোদিন পেটে কামড়। কোনোদিন বমিবমি ভাব। মরিয়ম কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, সত্যি তোমার মাথা ব্যথা করছে সেলিনা?

সেলিনা পাশ ফিরে শুয়ে বলল, তুমি সব সময় আমায় সন্দেহ করো আপা।

মরিয়ম বলল, এতদূর হেঁটে এসে না-পড়িয়ে যেতে আমার খারাপ লাগে কিনা, তাই।

ওই যা, হঠাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সেলিনা, তুমি বসো আপা, আমি এক্ষুনি আসছি। বলে দ্রুত বেরিয়ে গেল সে। খানিকক্ষণ পরে আবার ফিরে এলো। হাতে তিনখানা দশ টাকার নোট। মরিয়মের হাতে নোটগুলো গুঁজে দিয়ে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লো সেলিনা, সত্যি বলছি আপা। মাথাটা আজ ভীষণ ধরেছে।

মরিয়ম জানে, হাজার বোঝালেও ওকে আর এখন পড়াতে বসানো যাবে না। এখানে বুঝি হাসিনার সঙ্গে মিল আছে ওর। হাসিনাও এমনি ফাঁকি দেয় লেখাপড়ায়। গালাগাল করেও বইয়ের সামনে বসানো যায় না। এঘর থেকে ওঘরে পালিয়ে বেড়ায়। ছাতে গিয়ে বসে থাকে।

বাবা বলেন, ছোটবেলায় তোমরাও অমন ছিলে। এখনো কম বয়স ওর, বুদ্ধি হয়নি। বুদ্ধি হলে তখন আর বকাবকি করতে হবে না। আপনা থেকেই পড়তে বসবে।

মা বলেন, ওর বুঝি অল্প বয়স? আসছে মাসে তেরো পেরিয়ে চৌদ্দয় পড়বে। ও বয়সে মরিয়মকে দেখিনি? ওকে পড়তে বলতে হতো? আসলে তুমি ওকে বড় বেশি লাই দিচ্ছো। দেখবে ওর কিছু হবে না জীবনে।

বাবা সবসময় হাসিনার পক্ষ নেন। মা মরিয়মের। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে কথাই ভাবছিলো মরিয়ম।

সেলিনা জিজ্ঞেস করলো, কী ভাবছো আপা?

না, কিছু না। হাতের নোটগুলো ব্যাগের মধ্যে রেখে দিয়ে মরিয়ম বলল, তাহলে আমি চলি সেলিনা, তোমার মাকে বলো আমি এসেছিলাম। কাল আবার দেখা হবে, কেমন?

সেলিনা পাশ ফিরে শুয়ে অস্পষ্ট স্বরে বলল, আচ্ছা।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে পা বাড়াতে গতি শ্লথ হয়ে এলো তার। বৈঠকখানা ছেড়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনসুর। লম্বা গড়ন। সরু দেহ। পরনে একটা ঢোলা পায়জামা আর গায়ে ঘিয়ে রঙের মিহি পাঞ্জাবি। পায়ের শব্দে ওর দিকে ফিরে তাকালো মনসুর। একেবারে ওর মুখোমুখি। চোখজোড়া মাটিতে নামিয়ে নিয়ে পাশ কেটে চলে যাবে ভাবছিলো মরিয়ম।

এ কী! এসেই ফিরে চললেন যে! চলার পথে তার গতিরোধ সৃষ্টি করলো মনসুর।

সেলিনা আজ পড়বে না। ছোট উত্তরটা দিয়ে চলে যাচ্ছিল মরিয়ম।

মনসুর বলল, চলুন আমিও যাব ওপথে।

ওর নিজের তরফ থেকে কোনো আমন্ত্রণ না জানালেও কিছুদূর পিছুপিছু তারপর পাশাপাশি রাস্তায় নেমে এলো মনসুর।

আজ প্রথম নয়। এর আগেও এ-ধরনের প্রস্তাব সে পেয়েছে মনসুরের কাছ থেকে। শুধু প্রস্তাব নয়, মরিয়মকে বাসার কাছাকাছি এগিয়ে দিয়েও গেছে সে।

মরিয়মের ভালো লাগেনি। বড় বিরক্তিকর মনে হয়েছে এই অনাহূত সঙ্গদান। কথাবার্তা যে খুব হয়েছে তা নয়। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলো মরিয়ম কোথায় থাকে। আরেকদিন জানতে চেয়েছিল পরীক্ষা কেমন দিয়েছে মরিয়ম। এ ছাড়া এমনও দিন গেছে যেদিন সারাপথ নীরবে হেঁটেছে ওরা। বাসার কাছাকাছি তে-মাথায় এসে মনসুর বলেছে, আচ্ছা আসি এবার। আপনি তো ও-পথে যাবেন, আমি এ পথে। কিছুদূর গিয়ে লোকটা রিকশা নিয়েছে, তা ঠিকই লক্ষ করেছে মরিয়ম। মরিয়ম জানে, বেশ টাকাপয়সা আছে লোকটার। রিকশা কেন, ইচ্ছে করলে মোটরে চড়ে চলাফেরা করতে পারে। তবু এ পথটা মরিয়মের সঙ্গে হেঁটে আসতো মনসুর।

রাস্তায় নেমে মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিলো মরিয়ম, কেন সে নিষেধ করলো না লোকটাকে ? ইচ্ছে করলে তো মুখের ওপর জবাব দিতে পারতো। বলতে পারতো, আপনি সঙ্গে আসেন তা পছন্দ হয় না আমার। দয়া করে আর পিছু নেবেন না। ইচ্ছে করলে আরো রূঢ় গলায় আসতে নিষেধ করতে পারতো মরিয়ম। তবু কেন, একটা কথাও বলতে পারলো না সে ?

পাশাপাশি আসছিলো মনসুর। ইতিমধ্যে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে আগুন ধরিয়েছে সে। বারকয়েক তাকিয়েছে মরিয়মের দিকে। মৃদু ঘামছিলো মরিয়ম।

হঠাৎ হাত বাড়িয়ে একটা রিকশা থামালো সে। মনসুরকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে অনেকটা তাড়াতাড়ির সাথে রিকশায় উঠে বসলো মরিয়ম।

বেশ কিছুদূর আসার পর একবার পেছনে ফিরে তাকালো সে। দেখলো এদিকে চেয়ে বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে মনসুর। দেখে, প্রথমে হাসি পেলো তার। হেসে নিয়ে সে ভাবলো এমন ব্যবহারটা হয়তো উচিত হয়নি। লোকটি তাকে অভদ্র বলে মনে করতে পারে কিংবা অতি দাম্ভিক। এর কোনোটিই নয় মরিয়ম। মনসুরের এই গায়ে-পড়া ভাব তার ভালো লাগে না, এটাই হলো আসল কথা। কথাটা মনসুরকে ভদ্রভাবে বলে দিলেও তো পারতো সে। তাই ভালো ছিলো হয়তো। একটু আগের অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্যে মনে মনে অনুতপ্ত হলো মরিয়ম। কিন্তু পরক্ষণে আবার মনে হলো, সে অন্যায় কিছু করেনি। জাহেদের সঙ্গেও অমনি রূঢ় ব্যবহার করা উচিত ছিল তার। পারেনি বলেই মরিয়মকে তার শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে আজো। সব পুরুষই সমান। ওরা চায় শুধু ভোগ করতে। প্রেমের কোনো মূল্যই নেই ওদের কাছে। আর এই দেহটাকে পাবার জন্যে কত রকম অভিনয়ই না করতে পারে ওরা!

গলির মাথায় রিকশাটাকে বিদায় দিয়ে দিলো মরিয়ম।

এ পথটা হেঁটে যেতে হবে তাকে।

অন্ধকার গলিতে বিজলিবাতির প্রসার এখনো হয়নি। কয়েকটা কেরোসিনের বাতি আছে। টিমটিম করে সেগুলো জ্বলে। তাও সবসময় নয়। মাঝেমাঝে দুষ্ট ছেলেরা ঢিল মেরে চিমনিগুলো ভেঙে দেয়। তখন অন্ধকারে ডুবে থাকে গলিটা।

বাঁ হাতে শাড়িটা একটু গুটিয়ে নিয়ে আবর্জনার স্তূপগুলো এড়িয়ে সাবধানে এগুতে লাগল মরিয়ম। দু-পাশের জীর্ণ দালানগুলোতে এরমধ্যে ঘুমের আয়োজন চলেছে। সামনের বারান্দায় বসে কেউকেউ গল্প করছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সুর করে পড়ার আওয়াজও আসছে এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে। বুড়োদের সাংসারিক আলাপ-আলোচনা, আদেশ-উপদেশ, আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তিগুলো গলি বেয়ে হাঁটতে গেলে সহজেই কানে আসে।

বাসার কাছাকাছি আসতে ওপাশের দোতলা বাড়ি থেকে ঝপ করে একবালতি পানি কে যেন ঢেলে দিলো মরিয়মের গায়ে। সর্বাঙ্গ ভিজে গেল। প্রথম কয়েক মুহূর্ত একেবারে হকচকিয়ে গেল মরিয়ম। মুখ তুলে উপরের দিকে তাকাতে দেখলো, যে পানি ফেললো সে এইমাত্র মুখখানা সরিয়ে নিয়ে গেল তার। এমনি প্রায় হয়। রাস্তায় কেউ আছে কি নেই দেখে না তারা। ময়লা আবর্জনা, এমনকি বাচ্চা ছেলেমেয়েদের পায়খানাও জানালা গলিয়ে রাস্তায় ফেলে দেয়। কারো মাথায় পড়ল কিনা লক্ষ্য নেই। রাগে সমস্ত দেহ জ্বালা করে উঠল মরিয়মের। পরক্ষণে রীতিমতো কান্না পেলো তার। সবে গতকাল শাড়িটা ধুয়ে পরেছে। কে জানে কিসের পানি! ভাবতে গিয়ে সারা দেহ রি-রি করে উঠল। মনে হলো সে এক্ষুনি বমি করবে।

ওকে দেখে হাসিনা হট্টগোল বাঁধিয়ে দিলো। এ কী আপা, ভিজে চুপসে গেছিস যে ? কী হয়েছে অ্যাঁ। উপর থেকে পানি ফেলেছে বুঝি ! এ হে হে কী নোংরা পানি গো। মেঝেতে থু-থু ফেললো হাসিনা। ওমা, মা দেখে যাও।

মরিয়ম স্যান্ডেলজোড়া দ্রুত খুলে রেখে কুয়োতলার দিকে যেতে যেতে বললো, আমার ছাপা শাড়িটা আর গামছাটা একটু দিয়ে যা হাসিনা।

মা নামাজ পড়ছিলেন।

বাবা হ্যারিকেনের আলোয় বসে বসে খোকনকে পড়াচ্ছিলেন। 'হুমায়ূনের মৃত্যুর পর আকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।' হাসিনার চিৎকার শুনে এবং মরিয়মকে সাবান নিয়ে কুয়োতলার দিকে তাড়াহুড়া করে চলে যেতে দেখে বই থেকে মুখ তুলে তাকালেন তিনি, কী হয়েছে অ্যাঁ। কী হয়েছে ?

মরিয়ম কিছু বলল না।

শাড়ি আর গামছা হাতে চাপা আক্রোশে পাড়ার লোকদের যমের বাড়ি পাঠাতে পাঠাতে একটু পরে এ-ঘরে এলো হাসিনা।

হাসমত আলী আবার মুখ তুললেন বই থেকে, কী হয়েছে অ্যাঁ।

হাসিনা মুখ বিকৃত করে বলল, আপার গায়ে কারা নোংরা পানি ঢেলে দিয়েছে।

কারা ঢাললো, কোথায় ঢাললো ? হাসমত আলী ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। হাসিনা কুয়োতলায় শাড়ি আর গামছাটা রেখে এসে বলল, আপা আসছিলো, উপর থেকে কারা একবালতি ময়লা পানি ঢেলে দিয়েছে ওর গায়ে।

হাসমত আলী শুনে বললেন, চোখ বন্ধ করে হাঁটে নাকি, দেখে হাঁটতে পারে না।

তোমার যত বেয়াড়া কথা। নামাজের সালাম ফিরিয়ে সালেহা বিবি বললেন, উপর থেকে যারা ময়লা পানি ফেলে তাদের চোখ কি কানা হয়েছে ? তারা মানুষ দেখে না ? খোদা কি তাদের চোখ দেননি ?

স্ত্রীর কথায় প্রতিবাদ না করে চুপ হয়ে গেলেন হাসমত আলী। একটুকাল নীরব থেকে সালেহা বিবি বাকি নামাজ শেষ করার জন্যে নিয়ত বাঁধলেন। সহজে ঘটনাটার ইতি করে দিয়ে হাসিনা শান্তি পাচ্ছিলো না। সিঁড়ি বেয়ে ছাতে উঠে এসে পাশের বাড়ির বউটিকে ডেকে সবকিছু শোনালো সে। আপা আসছিলেন, হঠাৎ তার মাথায় একবালতি ময়লা পানি ঢেলে দিয়েছে কে। আল্লা করুক, যে-হাতে পানি ঢেলেছে সে-হাতে কুষ্ঠ হোক তার, কুষ্ঠ হয়ে মরুক।

উত্তরে পাশের বাড়ির বউটি জানালো— কিছুদিন আগে তার ছোট দেবর আসছিল এমনি রাতে, কারা তার মাথার ওপর একরাশ ছাই ফেলে দিয়েছিলো। লোকগুলো সব ইয়ে—।

নিচে এসে হাসিনা দেখলো মরিয়ম স্নান সেরে ফিরে এসেছে। বসে বসে চুলে চিরুনি বুলোচ্ছে সে। সামনে টেবিলের ওপর তিনখানা দশ টাকার নোট। দেখে চোখজোড়া বড় বড় করে ফেলল হাসিনা। তারপর ছোঁ মেরে নোটগুলো তুলে নিয়ে বললো, তুই বুঝি আজ টাকা পেয়েছিস আপা? আমাকে লিলি আপার মতো একটা শাড়ি কিনে দিতে হবে। নইলে আমি ওগুলো আর দেবো না, সত্যি দেবো না বলছি, কিনে দিবি কিনা বল্ না আপা। দু-হাতে মরিয়মকে জড়িয়ে ধরলো হাসিনা। মরিয়ম বললো, এখন না, স্কুলের চাকরিটা যদি পেয়ে যাই তাহলে কিনে দেবো, কথা দিলাম।

তার কোনো ঠিকঠিকানা আছে? অনিশ্চয়নির্ভর হতে রাজি হলো না হাসিনা। কবে যে চাকরি হবে—হয় কিনা তাই কে জানে। শাড়ি যদি না কিনে দিস, একটা ব্লাউজ-পিস কিনে দিবি বল্?

মরিয়ম কথা দিলো, একটা ব্লাউজ-পিস সে কিনে দেবে। আশ্বস্ত হয়ে টাকাগুলো ফিরিয়ে দিতে রাজি হলো হাসিনা। কিন্তু তক্ষুনি দিলো না, ওগুলো কিছুক্ষণ থাকে ওর কাছে। হাতে নিয়ে আঁচলে বেঁধে ব্লাউজের মধ্যে রেখে এবং আবার বের করে নানাভাবে নোটগুলোর উষ্ণতা অনুভব করলো সে।

ভাত খেতে বসে সালেহা বিবি বললেন, 'দে, ওগুলো ট্রাঙ্কে রেখে দি, তোর কোনো ঠিক আছে, কোথায় হারিয়ে ফেলবি। দে এ দিকে।'

একলোকমা ভাত মুখে তুলে দিয়ে হাসিনা সরোষ দৃষ্টিতে তাকালো মায়ের দিকে, তারপর নীরবে ভাতগুলো চিবোতে লাগলো।

গোল হয়ে তারা বসেছিল খেতে। বুড়ো হাসমত আলী, আর তার দুই মেয়ে মরিয়ম আর হাসিনা। সালেহা বিবিও খাচ্ছিলেন এবং পরিবেশন করছিলেন সকলকে। খোকন আর দুলু খেয়েদেয়ে অনেক আগে শুয়ে পড়েছে। মাহমুদ রোজ সন্ধ্যায় বেরিয়ে যায় ডিউটিতে, ফেরে সেই ভোর রাতে। আজ তার অফ-ডে। তবু রাত এগারোটার আগে ফিরবে না সে। অফিসে, রেস্তোরাঁয়, বন্ধুদের বাড়িতে আড্ডা দিয়ে তবে ফিরবে বাসায়। খাবারটা ওর ঘরে রেখে দেন সালেহা বিবি। ফিরে এসে খেয়ে ঘুমোয় মাহমুদ।

মরিয়মের পাতে একচামচ ঝোল পরিবেশন করে সালেহা বিবি বললেন, কাল গিয়ে একখানা শাড়ি কিনে এনো নিজের জন্যে। একটা বাড়তি শাড়ি নেই—।

মরিয়ম কিছু বলবার আগে হাসিনা জবাব দিলো, আর আমার জন্যে একটা ব্লাউজ-পিস।

সালেহা বিবি ধমকে উঠলেন, ওসব বাজে আবদার করো না।

হাসিনা সরোষ দৃষ্টিতে আরেকবার তাকালো মার দিকে।

হাসমত আলী এতক্ষণ নীরবে ভাত খাচ্ছিলেন, সামনের দুটো দাঁত পড়ে গেছে বহু আগে, উপর-পাটির দাঁতগুলো বড় নড়বড়ে, যে-কোনো মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে, তাই সতর্কতার সাথে ভাত খান খুব আস্তে আস্তে। দাঁতের ফাঁকে আটকে-যাওয়া একটা সরু কাঁটা আঙুল দিয়ে বের করে নিয়ে হাসমত আলী বললেন, তোমার স্কুলের চাকরিটার কী হলো ?

কথাটা মরিয়মকে উদ্দেশ্য করে।

মুখের কাছে তুলে-আনা ভাতের গ্রাসটা থালার ওপর নামিয়ে রেখে বাবার দিকে তাকালো মরিয়ম। বাবার প্রশ্নটা যেন ঠিক বুঝতে পারেনি সে।

ওকে চুপ থাকতে দেখে হাসিনা বলল, তোর স্কুলের চাকরিটার কী হলো জিজ্ঞেস করছেন বাবা। এতক্ষণ কী ভাবছিলি আপা ?

মরিয়ম অপ্রতিভ গলায় জবাব দিলো, তিন-চারদিনের মধ্যে জানা যাবে। বলে ভাতের থালায় মুখ নামালো সে। এতক্ষণ সেই অবাঞ্ছিত ঘটনাটির কথা ভাবছিলো মরিয়ম। সত্যি, মনসুরের সঙ্গে অমন বিশ্রী ব্যবহার না করলেই ভালো হতো। কে জানে, লোকটার হয়তো কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ছিলো না। নেইও। মরিয়ম মিছামিছি সন্দেহ করেছে তাকে। নিজের আশোভনতার জন্যে মনে মনে লজ্জিত হলো সে।

খাওয়া হলে পরে রোজ এঁটো থালা-বাসনগুলো ধুয়েমুছে গুছিয়ে রাখার কাজে মাকে সহায়তা করে মরিয়ম।

সালেহা বিবি মেয়ে-ভাগ্যে সুখ অনুভব করলেও মাঝে মাঝে বাধা দেন। বলেন, থাক না, ওগুলো আমিই করবো, তুই ঘরে যা।

মরিয়ম বলে, তুমি সারাদিন খাটো মা, তুমি যাও। এগুলো আমি গুছিয়ে রাখবো।

আনন্দে মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সালেহা বিবির। মেয়ে তাঁর দুঃখ-কষ্ট বোঝে। তাঁর শ্রমের স্বীকৃতি দেয়। এতেই তাঁর আনন্দ। তারা সুখী হোক। মা-বাবাকে সন্তুষ্ট রাখুক, এই শুধু চান তিনি। আর বেশি কিছু নয়।

খেয়েদেয়ে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছিলো মরিয়ম। হাসিনা বসে বসে পড়ছিলো, নিচে মাদুর পেতে। বুকের নিচে একটা বালিশ রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে সে। পড়ার ফাঁকে, মাঝে মাঝে একটু ঘুমিয়ে নেয়। জেগে আবার পড়ে। আবার ঘুমোয়। এ তার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।

এজন্যে প্রায়ই ওকে ধমকায় মরিয়ম। আজও ধমকালো, ও কী হচ্ছে ? উঠে সিধে হয়ে বসে পড়। শুয়ে শুয়ে পড়তে নেই কদিন বলেছি তোমায়।

বই থেকে মুখ না-তুলেই হাসিনা জবাব দিলো, আমার যেভাবে ভালো লাগবে সেভাবে পড়বো, তোমার তাতে কী ?

মরিয়ম বললো, এভাবে পড়লে বুকে ব্যথা করবে।

করুক, তাতে তোমার কী ? বইটা বন্ধ করে রেখে একটু ঘুমিয়ে নেবার জন্যে বালিশে মাথা রাখলো হাসিনা। মরিয়ম কী যেন বলতে যাচ্ছিল। দুয়ারে কড়া নাড়ার শব্দ হতে কথাটা আর বললো না সে। উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলো।

মাহমুদ এসেছে বাইরে থেকে। বগলে কতকগুলো বই। হাতে একটা কাগজের মোড়ক। মোড়কটা ওর হাতে তুলে দিয়ে মাহমুদ বললো, নাও এটা তোমাদের জন্যে এনেছি।

মরিয়ম সকৌতুকে তাকিয়ে বললো, এর মধ্যে কী?

কী তা আলোতে নিয়ে গিয়ে দেখতে পাচ্ছো না? বিরক্ত গলায় জবাব দিলো মাহমুদ। যাও একটা বাতি নিয়ে এসো চটপট করে।

ওঘর থেকে সব শুনতে পেয়ে বাতি হাতে দৌড়ে এলো হাসিনা, কী এনেছেরে আপা, দেখি দেখি।

দাঁড়াও দেখবে। অমন আদেখলেপনা করো না। এসব ভালো লাগে না আমার।

নিজের ঘরে এসে বইগুলো মেঝেতে নামিয়ে রাখল মাহমুদ। তার ঘরে কোনো আসবাবপত্র নেই। একটা কাপড় রাখার আলনাও নয়। মেঝেতে পাশাপাশি তিনটে মোটা মাদুর বিছানো। একপাশে তার স্তূপীকৃত খবরের কাগজ। তায়ে তায়ে রাখা। বাকি তিনপাশে শুধু বই। মাঝখানে ওর শোবার বিছানা। বিছানা বলতে একটা সতরঞ্জি, একটা চাদর আর একটা বালিশ।

মরিয়মের হাত থেকে মোড়কটা নিয়ে ওদের বসতে বললো মাহমুদ। নিজেও বসলো। তারপর আস্তে করে বলল, এর ভেতর কী আছে তা দেখবার আগে তোমাদের কিছু বলতে চাই আমি।

হাসিনা ফিক করে হেসে দিয়ে বললো, বলো।

মরিয়ম গম্ভীর।

মাহমুদ ওদের দুজনের দিকে ক্ষণকাল স্থিরচোখে তাকিয়ে থেকে বললো, দুর্ঘটনাবশত হোক আর যেমন করে হোক, তোমরা আমার বোন। তাই নয় কি?

হাসিনা আঁচলে মুখ টিপে বললো, হ্যাঁ।

মরিয়ম কিছু বললো না। নীরবে মাথা নাড়লো।

মাহমুদ আবার বললো, তোমাদের প্রতি আমার একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে, তা বিশ্বাস করো?

দুজনে ঘাড় নোয়ালো ওরা। হ্যাঁ।

মোড়ক খুলতে খুলতে মাহমুদ বললো, তোমাদের জন্য কিছু চুলের ফিতা আর মাথার কাঁটা এনেছি আমি। দেখো পছন্দ হয় কিনা?

ফিতাজোড়া মাহমুদের হাত থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে হাসিনা বললো, কী সুন্দর। নাচতে নাচতে মাকে দেখাবার জন্যে নিয়ে গেলো সে।

মরিয়ম উঠলো। মাহমুদ বললো, বসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার।

মরিয়ম বললো, তুমি ভাত খাবে না?

না, এক বন্ধুর বাসা থেকে খেয়ে এসেছি আমি। মাথা নেড়ে ওকে নিষেধ করলো মাহমুদ। বললো, তোমার সঙ্গে যে মেয়েটি আজ এসেছিলো, সে কে জানতে পারি কি? অবশ্য তোমার যদি আপত্তি না থাকে।

মরিয়ম বললো, ওর নাম লিলি, আমার সঙ্গে পড়তো কলেজে।

মাহমুদ বললো, থাক তার নাম আমি জানতে চাইনি। জানতে চেয়েছিলাম ওর সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কী, জেনে খুশি হলাম।

সহসা দুজনে ওরা নীরব হয়ে গেলো।

পাশের ঘর থেকে মা-বাবা আর হাসিনার গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মৌন ভেঙে মাহমুদ বললো, তুমি কী করবে ঠিক করেছো?

মরিয়ম বললো, এখনো কিছু ঠিক করিনি, দেখি স্কুলের চাকরিটার কী হয়।

মাহমুদ বললো, তোমার বান্ধবী লিলি না কী নাম বললে সে কী করে শুনি?

মরিয়ম দাদার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো, সেও একটা চাকরির খোঁজে আছে।

হুঁ। মাহমুদ ক্ষণকাল চুপ থেকে বললো, যাও এখন ঘুমোব আমি।

কাগজে মোড়ানো চুলের কাঁটাগুলো তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলো মরিয়ম। ও চলে গেলে একটা সিগারেট ধরিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো মাহমুদ। হাত বাড়িয়ে মাথার কাছে রাখা হ্যারিকেনটা নিভিয়ে দিলো সে।

এখন সমস্ত ঘরটা অন্ধকারে ঢাকা।

চারপাশে তাকালে এই অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। সিগারেটের মাথায় শুধু একটুকরো আলো। বিড়ালের চোখের মতো জ্বলছে। আশা নামক মানুষের আদিম প্রবৃত্তিটিও বোধহয় চিরন্তন এমনি করে জ্বলে। পাশ ফিরে শুয়ে মাহমুদ ভাবলো। প্রধান সম্পাদক আজ কথা দিয়েছেন, আসছে মাস থেকে দশটাকা বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হবে তার। যদি তিনি তার কথা রাখেন তাহলে, সেই বাড়তি দশটাকা প্রতিমাসে ভাইবোনদের জন্যে খরচ করবে মাহমুদ। আর যদি ছলনার নামান্তর হয়, তাহলে?

আর ভাবতে ভালো লাগে না মাহমুদের। সিগারেটটা অন্ধকারে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করে সে। কিন্তু সহসা ঘুম তার আসে না। সহস্র চিন্তা এসে মনের কোণে ভিড় জমায়। মাঝে মাঝে মনে হয়, রোজ রাতে এমনি ভাবনার জাল বুনতে বুনতে হয়তো জীবনটা একদিন শেষ হয়ে যাবে তার। জ্বলে জ্বলে ক্ষয়ে-যাওয়া মোমবাতির মতো ধীরে ধীরে ফুরিয়ে যাবে সবকিছু।

নিউজ সেকশনের লম্বা ঘরটা এখন চোখের ওপর ভাসে।

অনেক আশা নিয়ে একদিন 'মিলন' পত্রিকায় চাকরি নিয়েছিলো মাহমুদ। সাব-এডিটরের চাকরি। মাসে পঞ্চাশ টাকা বেতন। অর্থের চেয়ে আদর্শ সাংবাদিক হওয়ার বাসনাই ছিলো প্রবল। কালে কালে একদিন লুই ফিশার হবে।

শুনে, সিনিয়ার সাব-এডিটর আমজাদ হোসেন শব্দ করে হেসে উঠেছিলেন। লুই ফিশার হবে? বেশ বেশ। অতি উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা বটে। বছরখানেক কাজ করো। তারপর লুই ফিশার কি চিংড়ি ফিশার দুটোর একটা নিশ্চয় হতে পারবে।

বুড়োটার ওপর রাগে চোখমুখ লাল হয়ে গিয়েছিলো মাহমুদের। গালাগাল দিতে ইচ্ছে করছিলো তাকে।

আহা, শুধু শুধু বেচারাকে অমন হতাশ করে দিচ্ছেন কেন?

আরেকজন বলেছিল, টেবিলের ওপাশ থেকে।

তারপর!

তারপর আর ভাবতে পারে না মাহমুদ। একটু পরে ঘুমিয়ে পড়ে সে।

সকালে ঘুম ভাঙতে মুখহাত ধুয়ে বাইরে বেরুবে বলে ভাবছিলো মাহমুদ। একটুকরো পাউরুটি আর এককাপ চা এনে ওর সামনে নামিয়ে রেখে সালেহা বিবি বললেন, তুই কি বেরুবি এখন?

হ্যাঁ! দড়িতে ঝুলিয়ে রাখা জামাটা নামিয়ে নিয়ে মাহমুদ বললো, আমার একটা কাজে যেতে হবে।

খানিকক্ষণ ইতস্তত করে সালেহা বিবি বললেন, তোর বাবার শরীরটা আজ ভালো নেই। বাজারটা একটু দিয়ে যা।

মাহমুদ কোনো জবাব দিলো না তার কথার। যেন শুনতে পায়নি এমনি ভাব করে নীরবে পাউরুটির টুকরোটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগলো সে। মা আবার বললেন, কিরে কিছু বলছিস না যে? টাকা আনবো?

না। মাহমুদ নির্বিকারভাবে জবাব দিলো, আমার কাজ আছে বললাম তো।

কোন্‌দিন তোর কাজ না থাকে? সালেহা বিবি গম্ভীর হয়ে গেলেন। বুড়োটা রোজ বাজার করে এনে খাওয়ায়, এ বুড়ো বয়সে তাকে কষ্ট দিতে লজ্জা হয় না তোদের?

রুটির টুকরোটা পিরিচের ওপর নামিয়ে রেখে মাহমুদ বললো, আর আমি আহ্লাদে ঘুরে বেড়াই, তাই না মা? রাতের পর রাত যে আমার তোমাদের জন্যে জেগে কাজ করতে হয় তার কোনো মূল্য নেই, না? চায়ের পেয়ালাটা সামনে থেকে সরিয়ে দিলো মাহমুদ। রুটির পিরিচটাও ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে।

রাগে চোখমুখ লাল হয়ে গেলো সালেহা বিবির। উষ্ণ গলায় তিনি জবাব দিলেন, তুই সারারাত জেগে কাজ করিস আর বুড়োটা কি বসে খায়? সারাজীবন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে রোজগার করে এনে খাইয়েছেন।

হয়েছে এবার থামো তুমি মা। জামাটা গায়ে দিতে দিতে জবাব দিলো মাহমুদ, ও কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে তবু রোজ একবার করে শোনাবে তুমি।

ওকি, চা-টা কী অপরাধ করলো? খেয়ে নে না ওটা। বাজারের প্রসঙ্গ ভুলে গিয়ে ছেলেকে চা খাওয়ানোর প্রতি লক্ষ্য দিলেন সালেহা বিবি। ওকি, চলে যাচ্ছিস কেন, চা-টা খেয়ে যা।

থাক, ওটা তুমি খাওগে। হনহন করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো মাহমুদ। ও চলে যেতে ক্ষোভে দুঃখে চোখ ফেটে কান্না এলো সালেহা বিবির। আঁচলে চোখ মুছে ব্যথা স্বরে জড়ানো নিজেকে ধিক্কার দিলেন তিনি, কোন্ দুঃখে পেটে ধরেছিলাম তোদের।

কথাটা কানে এলো হাসমত আলীর। ও-ঘর থেকে গলা উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে?

স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনে নীরব হয়ে গেলেন সালেহা বিবি। এসব কথা স্বামীকে জানতে দিতে চান না তিনি। তাহলে তিনি মনে আঘাত পাবেন। হাসমত আলীও কোনো উত্তর না পেয়ে চুপ করে গেলেন।

মরিয়ম এসে বললো, একটু পরে আমি বাইরে বেরুবো মা। বাজারের টাকাটা দিয়ে দিও।

মা অবাক হয়ে বললেন, তুই যাবি?

মরিয়ম বললো, তাতে কিছু এসে যায় না মা, খোকনকে সঙ্গে দিও।

হাসমত আলী এতক্ষণ মা-মেয়ের আলাপ শুনছিলেন, শেষ হলে বললেন, ও কেন, আমি যাবো বাজারে।

সালেহা বিবি বললেন, তোমার শরীর খারাপ লাগছে, বলছিলে না?

ও কিছু না। আস্তে করে জবাব দিলেন হাসমত আলী।

ঘর থেকে সেই-যে হনহন করে বেরিয়ে এলো মাহমুদ, তারপর অনেকপথ মাড়িয়ে এ-গলি ও-গলি পেরিয়ে, বিশ্রামাগারের সামনে এসে দাঁড়ালো সে। দুটো বাইলেন এসে যেখানে মিলেছে তারই সামনে ছোট্ট একটা রেস্তোরাঁ। ভেতরে ঢুকতে কেরোসিন কাঠের কাউন্টারের ওপাশ থেকে ম্যানেজার খোদাবক্স বলে উঠলো, ইয়ে হয়েছে মাহমুদ সাহেব, আজকের খবরের কাগজ পড়েছেন ?

কোণের টেবিলে তিনটে ছেলে গোল হয়ে বসেছিলো, তাদের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে মাহমুদ জবাব দিল, না আজকের কাগজ তো আমি পড়িনি। ওর গলার স্বরটা রুক্ষ।

খোদাবক্স বুঝতে পারলো আজ মেজাজটা ভালো নেই ওর। তাই গলাটা আরো একটু মোলায়েম করে বললো, একটা ভালো চাকরির বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে আজ।

মাহমুদ কিছু বলবার আগে বাকি তিনজন একসঙ্গে বলে উঠলো, তাই নাকি। দেখি দেখি পত্রিকাটা।

কোলের ওপর থেকে পত্রিকাটা নিয়ে ওদের দিকে ছুড়ে দিলো খোদাবক্স। তার খদ্দেরদের বেকারত্ব ঘুচুক, তারা ভালো চাকরি পাক, এটা সে আন্তরিকভাবে কামনা করে। অবশ্য ভালো চাকরি পেলে তারা হয়তো এ রেস্তোরাঁয় আর আসবে না, অভিজাত রেস্তোরাঁয় গিয়ে খাবে। এদিক থেকে ওদের হারাবার ভয়ও আছে খোদাবক্সের, কিন্তু বাকি টাকাগুলো ওদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে, এই তার সান্ত্বনা। তা ছাড়া ভালো একটা চাকরি পেলেই-যে ওরা তাকে ত্যাগ করবে সেটা ভাবাও ভুল। হাজার হোক, চক্ষুলজ্জা বলে একটা প্রবৃত্তি আছে মানুষের। দুর্দিনে ওদের বাকিতে খাইয়েছে খোদাবক্স, সে কথা কি এত সহজে ভুলে যাবে ওরা ? অবশ্য না-ছেড়ে যাবার আরেকটা কারণ আছে। সেটা হলো, শ-খানেক হাত দূরের মেয়ে-স্কুলের ওই লাল দালানটা। ওখানকার সব খবরই রাখে খোদাবক্স। কোন্ মেয়েটি বিবাহিতা, আর কোন্‌টি কুমারী। কোন্ মেয়েটির বাবা বড় চাকুরে আর কোন্‌টির বাবা কেরানি। সব খবর রাখে খোদাবক্স। উৎসাহী খদ্দেরদের পরিবেশন করে সে। তাদের অতৃপ্ত আত্মাকে তৃপ্ত করে।

পত্রিকাটি মাটিতে পড়ে গিয়েছিলো। তুলে নিয়ে টেবিলের ওপর বিছিয়ে চারজন একসঙ্গে ঝুঁকে পড়লো ওরা।

একটা প্রাইভেট ফার্মে পার্সোনাল এ্যাসিস্টেন্টের চাকরি।

মাসে দেড়শ টাকা বেতন।

খোদাবক্সের কাছ থেকে কাগজ-কলম নিয়ে নাম-ঠিকানা টুকে নিল মাহমুদ।

খোদাবক্স একগাল হেসে বললো, কেমন, বলিনি খুব ভালো চাকরি ?

মাহমুদ বললো, হবে না, শুধু কাগজ-কালি খরচ করা।

রফিক বললো, তবু দেখা যাক না একবার কপাল ঠুকে।

নঈম বড় রোগাটে, চেহারাখানাও তার বড় ভালো নয়, বললো, আমার মুখ দেখেই বেটারা বিদায় দেবে।

খোদাবক্স বললো, সব খোদার ইচ্ছে। চারজন একসঙ্গে চেষ্টা করে দেখুন-না, একজনের হয়েও যেতে পারে।

এককাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে মাহমুদ চুপচাপ পত্রিকার পাতা ওল্টাতে লাগলো। চা খাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ এখানে বসে থাকবে সে। এটা-সেটা নিয়ে তর্ক করবে। আর মাঝেমাঝে একটু অন্যমনস্ক হয়ে ভাববে, আশা নামক প্রবৃত্তিটি কত দুর্দমনীয়। পুরো

একটা বছর 'মিলন' পত্রিকার চাকরি করার পর আশার ক্ষীণ অস্তিত্বও লোপ পাওয়া উচিত ছিলো। তবু এখনো-যে কেমন করে তার রেশ জেগে আছে মনে, ভেবে বিস্মিত হয় মাহমুদ। লুই ফিশার হওয়ার কল্পনায় যে-একদিন বিভোর ছিল, সে আজ আর তেমনি স্বপ্ন দেখতে পারে না।

প্রাত্যহিক ঘটনার অভিজ্ঞতায় স্বপ্নগুলো ভেঙে খানখান হয়ে গেছে তার।

একদিনের কথা মনে পড়ে। সেদিন রাতে ডিউটি ছিলো তার। নিউজ সেকশনের লম্বা টেবিলটার সকলে কর্মব্যস্ত। এ-সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো পৌঁছোয় এসে। তাই কাজের ভিড় বেড়ে যায়। হাতের কাছে একটা ছোট্ট সংবাদ নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো মাহমুদ। পঁচিশ বছরের একজন শিক্ষিত যুবক বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। খবরটা কি ছাপতে দেবো ? নিউজ এডিটরের দিকে গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো মাহমুদ।

কাগজটা হাতে নিয়ে খবরটা পড়লেন নিউজ এডিটর। তারপর আস্তে ওটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বলল, বাদ দিন। স্পেস নেই।

কেন, স্পেস তো অনেক আছে ! কথাটা হঠাৎ বলে ফেললো মাহমুদ।

সরোষ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে নিউজ-এডিটর গম্ভীর গলায় বললেন, স্পেস আছে কি নেই, সেটা আপনার জানার কথা নয়।

তারপর নীরব হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না তার। এমনি ঘটনা প্রায়ই ঘটতো।

একদিন কোনো এক জনসভার লোকসমাবেশ নিয়ে তর্ক বেধে গেলো স্টাফ রিপোর্টারের সঙ্গে।

রিপোর্টার বলছিলেন, সভায় পাঁচহাজারের বেশি লোক হয়নি। মাহমুদ বললো, মিথ্যে কথা। পঞ্চাশ হাজারের ওপরে এসেছিলো লোক।

রিপোর্টার বললেন, আপনি চোখে বেশি দেখেন।

মাহমুদ বললো, আমি যদি বেশি দেখে থাকি আপনি তাহলে কম দেখেন।

কম দেখতে হয় বলেই দেখি। দুঠোঁটে একটুকরো হাসি ছড়িয়ে চুপ করে গেলেন স্টাফ রিপোর্টার।

সিনিয়র সাব-এডিটর আমজাদ হোসেন এতক্ষণ নীরবে ঝগড়া শুনছিলেন ওদের। দুজনে থামলে একটা পান মুখে দিয়ে বললেন, মাহমুদ সাহেব এখনো একবারে বাচ্চা রয়ে গেছেন আপনি। লোক যে কেমন করে বাড়ে আর কেমন করে কমে তার কিছুই বোঝেন না। বলে শব্দ করে একপ্রস্থ হেসে উঠেছিলেন তিনি।

বয় এসে সামনে চা নামিয়ে রাখতে ভাবনায় ছেদ পড়লো।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে মাহমুদ বললো, তুমি ঘাবড়িয়ো না খোদাবক্স. সামনের মাস থেকে দশটাকা বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হবে আমার, তার থেকে কিছুকিছু করে একবছরে সব পাওনা পরিশোধ করে দেবো তোমার। বুঝলে ?

খোদাবক্স একমুখ হেসে বললো, তাই নাকি ? বড় ভালো কথা, বড় ভালো কথা, শুনে বড় খুশি হলাম।

নঈম বললো, এরপর আমাদের এককাপ করে চা খাওয়ান উচিত তোমার মাহমুদ।

মাহমুদ নির্বিকার গলায় বললো, খাও। বলে বয়কে ওদের তিনকাপ চা দেবার জন্যে আদেশ করলো সে। খোদাবক্সকেও এককাপ দিতে বললো। বয় চা নিয়ে এলে পর সামনে ঝুঁকে পড়ে মাহমুদ বললো, দশটা টাকা যদি বাড়ে আমার, তাহলে রোজ একটা করে সিগারেট খাওয়াবো তোমাদের।

নঈম খুশি হয়ে বললো, আমার যদি চাকুরিটা হয়ে যায়, তাহলে রোজ এককাপ চা খাওয়াবো।

রফিক কিছু বললো না। ও একটু অন্যমনস্ক আজ।

তাহলে এ চাকরিটার জন্যে তুমি দরখাস্ত করছো? মাহমুদ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো।

হ্যাঁ। তুমিও করো। নঈম জবাব দিলো।

রফিক উঠতে যাচ্ছিলো। নঈম চেঁচিয়ে উঠলো, ওকি যাচ্ছো কোথায়, বসো।

রফিক বললে, আর কত বসবো? বোধ হয় আসবে না আজ।

মাহমুদ জিজ্ঞেস করবে ভাবছিলো, সে কে?

নঈম বললো, আরেকটু বসো, এই এসে পড়বে, আজ বোধহয় ঘোড়ার গাড়িটা কোথাও আটকে পড়েছে; কে জানে হয়তো রেলওয়ে ক্রসিং-এর ওখানে হবে।

মাহমুদ এতক্ষণে বুঝলো, একটি মেয়ের অপেক্ষা করছে রফিক। ঘোড়ার গাড়িতে করে আসবে মেয়েটি। এখান থেকে রফিক দেখবে তাকে। শুধু চোখের দেখা।

মেয়ের কথা উঠতে খোদাবক্স বললো, আপনাকে কত করে বলেছিলাম মাহমুদ সাহেব, সেই মেয়েটার সঙ্গে ঝুলে পড়ুন। তাহলে কি আজকে আপনার এই অবস্থা হতো? এতদিনে হ্যাট টাই পরে মোটরগাড়ি হাঁকাতেন।

তার দিকে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানলো মাহমুদ। কিছু বললো না। নঈম বললো, হ্যাঁ, তাইতো! আজকাল সে মেয়েটিকে আর দেখি না তো! বিয়ে হয়ে গেছে বুঝি?

খোদাবক্স মুখখানা বিকৃত করে বললো, বিয়ে হয়ে যাবে না তো কী? ওরা হলো বড়লোকের মেয়ে, বড় মহার্ঘ বস্তু। ও কি ফেলনা যে ঘরে থাকবে? কত ছেলে লাইন বেঁধে থাকে বিয়ে করার জন্যে।

হয়েছেও তাই। এইতো গেলো মাসে মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে এক ইঞ্জিনিয়ারের সাথে। ছেলেটির বড় জোর বরাত, বিয়ের কিছুদিন পরেই স্কলারশিপ বাগিয়ে আমেরিকায় চলে গেছে।

নঈম প্রশ্ন করল, আর সে মেয়েটি?

মেয়েটিকে কি রেখে যাবে নাকি? খোদাবক্স জবাব দিলো, সঙ্গে করে নিয়ে গেছে আমেরিকায়।

পত্রিকার ওপর ঝুঁকে পড়ে মাহমুদ একটা খবর পড়ায় মনোযোগী হবার চেষ্টা করলো কিন্তু কিছুতে মন বসাতে পারলো না সে। কাগজটা মুড়ে রেখে অনেকটা বিরক্তির সাথে উঠে দাঁড়ালো সে। তারপর আকস্মিকভাবে 'চলি' বলে বিশ্রামাগার থেকে বেরিয়ে এলো মাহমুদ। বেরুবার পথে সে শুনতে পেলো নঈম বলছে— আহা, যাবে আর কী, বসো না। ঘোড়ারগাড়িটা আসতে আজ বড় দেরি হচ্ছে, নিশ্চয়ই এসে পড়বে এক্ষুনি। বসো, আরেক কাপ চা খাও।

বুঝতে কষ্ট হলো না মাহমুদের, রফিককে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলছে নঈম।

বিশ্রামাগার থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে ভাবছিলো মাহমুদ, পেছনে কে যেন নাম ধরে ডাকলো। ফিরে তাকিয়ে দেখে শাহাদাত দাঁড়িয়ে। পরনে একটা পায়জামা, গায়ে পাঞ্জাবি আর হাতে গুটিকয় বই।

কিহে, এখানে কোথায় এসেছিলে ? পুরোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে মনটা ভালো হয়ে গেলো মাহমুদের।

শাহাদাত বললো, প্রেসের কিছু টাকা পাওনা ছিলো একজনের কাছে, দু-বছর আগের টাকা। হেঁটে হেঁটে সারা হলুম, আজ দেবো কাল দেবো করে ব্যাটা শুধু ঘুরাচ্ছে আমায়।

মাহমুদ গম্ভীর হয়ে বললো, বাকি দাও কেন ?

শাহাদাত বললো, আগে কয়েকটা কাজ করিয়েছিলো, তাই দিয়েছি।

হু! মাহমুদ চুপ করে গেলো।

খানিকক্ষণ পর শাহাদাত আবার বললো, তুমিতো আজকাল আর ওদিকে আসো না, আমেনা প্রায় তোমার কথা জিজ্ঞেস করে। আসো না একদিন ?

মাহমুদ সংক্ষেপে বললো, আসবো।

শাহাদাত শুধালো, কবে ?

মাহমুদ বললো, সে দেখা যাবে পরে। এসো তোমাকে এককাপ চা খাওয়াই।

পুরানো বন্ধুকে সাথে নিয়ে আবার বিশ্রামাগারে ফিরে এলো মাহমুদ।

কোণের একখানা টেবিলে এসে দুজনে বসলো ওরা।

নঈম আর রফিক ঝুঁকে পড়ে নিজেদের মধ্যে কী যেন আলাপ করেছে। খোদাবক্স কাউন্টার থেকে মুখ তুলে মাহমুদকে এবং বিশেষ করে শাহাদাতকে লক্ষ করলো, উৎসুক চোখে। নতুন খদ্দের। এর আগে কখনো দেখেনি তাকে।

এককাপ চায়ের অর্ডার দিলো মাহমুদ।

শাহাদাত বললো, তুমি খাবে না ?

না। এই একটুকু আগে এককাপ খেয়ে বেরিয়েছি।

পকেট হাতড়ে বিড়ি আছে কিনা দেখলো মাহমুদ। বিড়ি নেই। মুখখানা গুমোট করে বসে রইলো সে।

শাহদাত শুধালো, কী হয়েছে ? মাহমুদ বললো, না, কিছু না। চুপ করে কেন, কথা বলো, ছেলেমেয়েরা সব কেমন আছে ?

ওদের কথা আর বলো না। হতাশ গলায় শাহাদাত বললো, বড়টার পেটের অসুখ আর ছোটটা সর্দি-কাশিতে ভুগছে।

হু। টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে হাতের তালুতে মুখ রাখলো মাহমুদ। বয় এসে সামনে চা নামিয়ে রাখতে বললো, নাও, চা খাও।

শাহাদাত নীরবে চা খেতে লাগলো।

মাহমুদ চুপচাপ।

পরদিন শঙ্কিত মন নিয়ে ছাত্রীর বাড়িতে এলেও একটা ব্যাপারে মরিয়ম নিশ্চিন্ত হতে পারলো না। মনসুরের সঙ্গে অমন দুর্ব্যবহার করা উচিত হয়নি। আজ যদি তার সঙ্গে দেখা হয়, এবং দেখা হবে তা জানতো, তাহলে তার কাছে ক্ষমা চাইবে সে। ক্ষমা যদি নাও চায়, তবু ভালোভাবে-ভদ্রভাবে কথা বলবে মনসুরের সঙ্গে। যতদিন তার কাছ থেকে কোনো অশোভনতা প্রকাশ না পায় ততদিন সহজ সম্পর্ক বজায় রাখবে মরিয়ম।

বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেলিনা কী যেন করছিলো। ওকে আসতে দেখে মৃদু হেসে অভ্যর্থনা জানালো।

মরিয়ম বললো, আমার আজ একটু দেরি হয়ে গেছে সেলিনা।

সেলিনা বললো, আমি ভাবছিলাম আর তুমি আসবে না আপা।

অহেতুক চমকে উঠলো মরিয়ম। সেলিনাকে কিছু বলেনি তো মনসুর?

পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, কেন বলো তো?

সেলিনা নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে জবাব দিলো, রোজ ঠিক সময়টিতে আসো কিনা, তাই।

ওর কথায় অনেকটা আশ্বস্ত হলো মরিয়ম। কিন্তু মনসুরকে আজ না-দেখে কিছুক্ষণের মধ্যে আবার একটা অস্বস্তি জেগে উঠলো ভেতরে। পড়াতে বসে বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো মরিয়ম। বাইরের ঘরে কোনো গলার আওয়াজ পেলেই কানখাড়া করে শুনতে চেষ্টা করলো কার গলা। আর যখন বুঝলো এ মনসুরের নয় তখন হতাশ হলো সে।

সেলিনা পড়ার ফাঁকে হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করলো, তোমার কি শরীরটা আজ ভালো নেই আপা?

মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো মরিয়মের। ইতস্তত করে বললো, কই নাতো। কেন আমায় দেখে কি অসুখ মনে হচ্ছে?

সেলিনা বললো, হ্যাঁ।

না, আমার কিছু হয়নি, তুমি পড়ো। ছাত্রীকে বইয়ের প্রতি মনোযোগী হতে আদেশ করলো মরিয়ম। তারপর সে ভাবলো—না, এসবের কোনো অর্থ হয় না। যা ঘটে গেছে তার জন্যে অনুতাপ কেন করবে মরিয়ম। অন্যায় সে কিছু করেনি। লোকটার যে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নেই, তার নিশ্চয়তা আছে? উদ্দেশ্য মহৎ হওয়ারও কোনো কারণ খুঁজে পেলো না সে। যেভাবে রোজরোজ পিছু নেয় তাতে তার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ জাগাটা স্বাভাবিক। কিন্তু লোকটাকে নিয়ে এত মাথা ঘামাতেই বা শুরু করেছে কেন মরিয়ম?

পড়ানো শেষ করে সবে বিদায় নেবে, এমন সময় মনসুরকে হঠাৎ দোরগোড়ায় দেখে প্রথমে অবাক হলো, পরমুহূর্তে ফ্যাকাশে এবং তারপর রক্তাভ হলো মরিয়ম।

মনসুর এগিয়ে বললো, কী খবর, কেমন আছেন?

ওর গলার স্বরে কোনো জড়তা নেই, গতকালের ঘটনার কোনো রেশ নেই, শুনে ঈষৎ বিস্মিত হলো মরিয়ম। পরক্ষণে সে মৃদু হেসে বললো, ভালো, আপনি কেমন? এতটুকু কথার এত উচ্ছ্বাস প্রকাশ নিজের কাছেই ভালো লাগলো না মরিয়মের।

মনসুর একটুকাল সন্ধানী-দৃষ্টিতে তাকালো। কণ্ঠস্বরটা ওর কাছেও বড় নতুন ঠেকছে আজ।

কয়েকটা নীরব মুহূর্ত।

কী যে হলো, বড় ভয় করতে লাগলো মরিয়মের। মুখ তুলে ওর দিকে তাকাতে সাহস হলো না। চলি সেলিনা। এক নিশ্বাসে কথাটা বলে দ্রুত রাস্তায় বেরিয়ে এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো মরিয়ম।

কিছুদূর এসে একবার পেছনে ফিরে দেখলো সে।

না। আজ আসছে না মনসুর।

প্রথমে কিছুটা স্বস্তিবোধ করলেও খানিকপরে মরিয়মের মনে হতে লাগলো বোধহয় লোকটা অসন্তুষ্ট ওর ব্যবহারে, তাই আজ আর এলো না এগিয়ে দিতে। মনটা খারাপ হয়ে গেলো মরিয়মের।

বাসায় ফিরতে, একটা মিহি কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলো মরিয়ম। খোকনকে সামনে পেয়ে উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছেরে খোকন ? কাঁদছে কে ?

খোকনের চোখজোড়া ছলছল করছিলো। ভাঙা ভাঙা গলায় সে বললো, ছোট আপাকে বাবা মেরেছে।

কেন ? প্রশ্নটা খোকনকে করলেও, তার উত্তরের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো না মরিয়ম। অন্ধকার ঘরে পা দিতে হাসিনার কান্নাটা আরো জোরে শোনা গেল। বিছানায় উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদছে সে। আবছা দেখা যাচ্ছে তাকে।

ওর গায়ের ওপর একখানা হাত রেখে মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলো মরিয়ম, কী হয়েছেরে হাসি ?

একঝটকায় ওর হাতখানা দূরে সরিয়ে দিলো হাসিনা।

খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে স্যান্ডেলটা চৌকির নিচে রেখে দিলো মরিয়ম। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ব্লাউজটা ধীরে ধীরে খুললো সে। বডিসটা খুলে রাখলো আলনার ওপরে। শাড়িটা পালটে নিলো। তারপর নিঃশব্দে মায়ের ঘরে এলো সে। কী হয়েছে মা, হাসিনা কাঁদছে কেন ? বলে মায়ের দিকে চোখ পড়তে রীতিমতো আর্তনাদ করে উঠলো মরিয়ম, এ কী ! কী হয়েছে মা ?

চওড়া চৌকিটার ওপর শুয়ে মা। মাথাটা আগাগোড়া ব্যান্ডেজ-করা। বাবা পাশে বসে মৃদু পাখা করছেন তাকে। হাসমত আলী হাতের ইশারায় মরিয়মকে জোরে কথা বলতে নিষেধ করলেন। সালেহা বিবি ঘুমোচ্ছেন এখন। তাকে জাগানো ঠিক হবে না।

একটুপর বাবার কাছ থেকে সব জানতে পেলো মরিয়ম। কতদিন তিনি বারণ করেছেন সকলকে, ছাতে উঠে দৌড়-ঝাঁপ না দিতে। পুরনো নড়বড়ে ছাত। কখন ভেঙে পড়ে কোনো ঠিকঠিকানা নেই। তবু রোজ ছাতে উঠে খেলবে হাসিনা। আজও বিকেলবেলা খেলছিলো সে। নিচে তোর মা বসে বসে চাল বাছছিলেন। পোয়াখানেক ওজনের একখানা ইট, ছাত থেকে খসে তার মাথার ওপর এসে পড়লো। বাইরে ওই কুয়োতলায় রাখা আছে, গিয়ে দেখে আয় তুই। ঘরের কোণে আলো নিয়ে দেখ কত রক্ত জমে আছে সেখানে। হাসমত আলী থামলেন।

তিনি তখন বাসায় ছিলেন। আয়োডিন আনিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছেন সালেহা বিবির মাথায়। রাতের রান্না-বান্না কিছুই হয়নি। দুলুটা কাঁদতে কাঁদতে এই একটু আগে ঘুমিয়ে পড়েছে। খোকনটারও খিদে পেয়েছে নিশ্চয়। যদিও মুখ ফুটে সে কিছু বলেনি এখনো। হ্যারিকেনের মৃদু আলোতে বসে বসে পড়ছে সে। মাঝে মাঝে উসখুস করছে, চোখ তুলে তাকাচ্ছে ওদের দিকে।

হ্যারিকেনের আগুনে কুপিটা ধরিয়ে নিয়ে পাকঘরে চলে গেলো মরিয়ম। হাসিনার কান্নাটা এখান থেকে শোনা যাচ্ছে। রাগের মাথায় ভীষণ মেরেছেন তাকে বাবা।

একটা তরকারি আর দুটো ভাত সিদ্ধ করে নামাতে বেশ রাত হয়ে গেলো। ঘুম থেকে তুলে দুলুকে নিজ হাতে খাইয়ে দিলো মরিয়ম। খোকনকে খাওয়ালো। তারপর সবার জন্য ভাত সাজিয়ে হাসিনাকে ডাকতে এসে মরিয়ম দেখলো, কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে হাসিনা।

প্রথমে দূর থেকে ডাকলো মরিয়ম, তারপর ওর গায়ে হাত রেখে জোরে নাড়া দিয়ে বললো, হাসি ওঠ, ভাত খাবি ওঠ, বাবা বসে আছেন তোর জন্যে।

বড় ক্লান্তি লাগছিলো ওর। হাত ধরে টেনে বললো, কইরে ওঠ।

হাসিনা নড়েচড়ে আবার চুপ করে রইলো।

হাসিনা ভাত খাবি ওঠ।

আমি খাবো না। হাসিনা জবাব দিলো, তোমরা খাওগে যাও।

ওঠ মিছামিছি রাগ করে না। নরম গলায় বললো মরিয়ম। তারপর দুহাতে ওকে বিছানা থেকে তোলার চেষ্টা করলো সে।

এই ভালো হবে না বলছি, এই-এই। ওর হাতে একটা কামড় বসিয়ে দিল হাসিনা।

উহ! বলে ওকে ছেড়ে দিলো মরিয়ম। হাসিনা আবার চুপচাপ।

ওকে একা ফিরে আসতে দেখে হাসমত আলী শুধোলেন, কী, হাসিনা এলো না ?

মরিয়ম আস্তে করে জবাব দিলো, ও খাবে না।

হাসমত আলী মাটির দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে কী যেন ভাবলেন। মুখখানা গম্ভীর এবং বিরক্তিপূর্ণ। একটু পরে, নিজেকে শোনাচ্ছেন যেন, এমনি করে বললেন, বয়স কি কম হয়েছে ওর ? তবু একটু কাণ্ডজ্ঞান হলো না। বিয়ে হলে ও স্বামীর ঘর করবে কেমন করে ?

মরিয়ম বললো, ভাত খাবে এসো বাবা।

হাসমত আলী বললেন, তুমি খাওগে, আমার খিদে নেই। স্ত্রীর পাশে বালিশটা টেনে কাত হয়ে শুলেন তিনি। মরিয়মকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবার বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, যাও খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো, অনেক রাত হয়েছে।

আরো অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো মরিয়ম।

তারপর পাকঘরে গিয়ে ভাত-তরকারিগুলো ভালোভাবে চাপ দিয়ে দু-গ্লাস জল খেয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেলো। থাক, সেও খাবে না আজ।

হাসিনা ঘুমোচ্ছে। মৃদু নাক ডাকছে ওর।

বাইরের দরজাটা বন্ধ করা হয়েছে কিনা দেখে এসে শুয়ে পড়লো মরিয়ম।

শুধু এই বাড়িতে নয়, পুরো পাড়াটায় ঘুম নেমেছে এখন। দু-একটা বাড়ি থেকে অন্ধকার কাঁপিয়ে মাঝেমাঝে শোনা যাচ্ছে দু-একটা গলার স্বর। গলির হ্যাংলা কুকুরগুলো ডাকছে কখনো কখনো। আর কোনো শব্দ নেই। কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঘুমোতে পারলেন না হাসমত আলী। রাতে ঘুম না–হওয়া বড় বেদনাদায়ক। বিশেষ করে এই নীরবতার মাঝখানে একরাত জাগতে গেলে, অনেক চিন্তা এসে জমাট বাঁধে মাথায়। একান্তভাবে কোনো কিছু চিন্তা করার এটাই বোধ হয় প্রকৃত সময়।

অতীত। ভবিষ্যৎ। বর্তমান।

ছুরি দিয়ে কেটে–কেটে জীবনটাকে বিশ্লেষণ করার মতো প্রবৃত্তি না হলেও, জীবনের ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তগুলো, টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো স্মৃতি হয়ে দেখা দেয় মনে। সেখানে আনন্দ আছে, বিষাদ আছে। ব্যর্থতা আছে, সফলতা আছে। হাসি আছে, অশ্রু আছে।

অতীতের মতো বর্তমানও যেন ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো ওঠা আর পড়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ভবিষ্যৎ কেমন হবে কেউ তা বলতে পারে না। তা কি খুব সুন্দর হবে, না আরো মলিনতায় ভরা হবে ভাবতে ভাবতে একটুখানি তন্দ্রা এসেছিলো। একটা ধাড়ি ইঁদুরের কিচকিচ ডাকে তন্দ্রা ছুটে গেলো তাঁর। চোখ মেলে চারপাশে তাকালেন হাসমত আলী। আবার চোখের পাতাজোড়া বন্ধ করলেন। তারপর ছেলেমেয়েদের কথা ভাবতে লাগলেন তিনি।

বড় ছেলে মাহমুদ। সবার বড় ও। কিন্তু ওর ওপর খুব বেশি নির্ভর করতে পারেন না তিনি। কী যে হবে ওর, খোদা জানেন। লেখাপড়া শিখেছে। বছর তিনেক হলো বি.এ. পাশ করেছে। তার এই গ্র্যাজুয়েট হবার পেছনে, নিজের কোনো অবদান খুঁজে পান না হাসমত আলী। পত্রিকায় চাকরি করে নিজের টাকায় পড়েছে মাহমুদ। মেট্রিক পাশ করার পর বাবার কাছে বেশি কিছু দাবি করেনি। দাবি করলেও দিতে পারতেন কিনা সন্দেহ। নিম্নপদস্থ কেরানির পক্ষে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো শুধু কষ্টসাধ্য নয়, দুরূহ বটে। তাই মাহমুদের নিজের ইচ্ছার ওপরে কোনোরকম খবরদারি করার সাহস পান না তিনি। জোর করে কিছু নির্দেশ দেবার পিতৃসুলভ ইচ্ছে থাকলেও তাকে দমন করেন হাসমত আলী। নিজেকে অপরাধী মনে হয় ছেলের কাছে।

মরিয়মের কাছেও অপরাধী হাসমত আলী। মেট্রিক পর্যন্ত ওর পড়ার খরচ জুগিয়েছেন তিনি, তারপর এ-বাড়ি ও-বাড়ি ছাত্রী পড়িয়ে কলেজে পড়েছে মরিয়ম। এইতো মাস দুয়েক হলো ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছে সে।

তারপর হাসিনা—

ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়েন হাসমত আলী। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেন।

সেই যে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বাসা থেকে বেরিয়ে গেল মাহমুদ, তারপর দু-দিন তার কোনো দেখা নেই।

এমনি হয়।

মাঝে মাঝে বাসার সবার সঙ্গে ঝগড়া করে কয়েকদিনের জন্যে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় মাহমুদ। বন্ধু-বান্ধবের বাসায় গিয়ে থাকে। হোটেল-রেস্তোরাঁয় খায়। পকেটে পয়সা না থাকলে উপোস করে কাটায়।

সকালে তখনো মাথার যন্ত্রণায় গায়ে মৃদু জ্বর ছিল সালেহা বিবির। মরিয়মকে ডেকে শুধোলেন তিনি, হ্যাঁরে, মাহমুদ ফিরেছে?

মায়ের পাশে বসে মরিয়ম সংক্ষেপে বললো, না।

মা যন্ত্রণায় কাতর গলায় বললেন, কার যে স্বভাব পেলো ও। কিছু বলবার উপায় নেই, অমনি রাগ করবে। ওকে নিয়ে আমি কী করি বল্‌তো?

মায়ের কিছু বলতে যাবার আগে হাসমত আলী উষ্ণ গলায় বললেন, কী দরকার ছিলো ওকে রাগাবার। জানো তো ও ওরকম, তবু ওসব কথা বলতে গেলে কেন।

খোকনের কাছ থেকে মাহমুদের বাড়ি না-আসার কারণটা জানতে পেরেছিলেন তিনি। তখন থেকে স্ত্রীর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন হাসমত আলী। মাহমুদকে কোনো কারণে রাগাবার পক্ষপাতী তিনি নন। স্বভাবে উচ্ছৃঙ্খলতা দোষ থাকলেও সে নিশ্চয় বখাটে ছেলে নয় তা বোঝেন হাসমত আলী। সংসারে টাকা-পয়সা দিয়ে প্রতিমাসে সাহায্য করছে সে। লেখাপড়া আর জানাশোনার দিক থেকেও বাবার চেয়ে সে অনেক বড়। তা ছাড়া ছেলেমেয়েদের সকলের ভবিষ্যৎ ওর হাতে নির্ভর করছে। নিজে যে-কোনো সময় মারা যেতে পারেন, সে জ্ঞান রাখেন হাসমত আলী। তখন মাহমুদ না থাকলে কে দেখবে ওদের? মরিয়ম মেয়ে, ওর ওপর কতটুকু ভরসা করা যেতে পারে? দিন সবসময়

একরকম যায় না। মাহমুদ একদিন একটা ভালো চাকরি পেয়ে যেতে পারে সে আশাও রাখেন হাসমত আলী।

হাসমত আলীর কথার জবাবে উচ্চবাচ্য করলেন না সালেহা বিবি। নীরবে ছাতের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। মরিয়ম উঠে যেতে-যেতে বললো, তুমি এ নিয়ে বেশি ভেবো না মা। দুপুরে অফিসে গিয়ে ওর খোঁজ নেবো আমি।

হাসমত আলী অফিসে গেলে, মায়ের আশেপাশে অনেকক্ষণ ঘোরাফেরা করলো হাসিনা। ইট পড়ে তাঁর মাথা ফেটে গেছে, সেজন্যে মনে মনে অনুতপ্ত সে।

সালেহা বিবির চোখে তন্দ্রা ছিলো, তাই প্রথমে নজরে আসেনি। পরে দৃষ্টি পড়তে ইশারায় তাকে কাছে ডাকলেন তিনি। ইতস্তত করে দূরে দাঁড়িয়ে রইলো হাসিনা।

সালেহা বিবি আবার ডাকলেন, এদিকে আয় হাসি।

এবারে গুটিগুটি পায়ে পাশে এলো হাসিনা। ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে মা বললেন, তোর মুখখানা এত শুকনো কেন রে?

মায়ের বুকে মুখ গুঁজে হঠাৎ কেঁদে উঠলো হাসিনা। মা, আমি আর উঠবো না মা। আর ছাতে উঠবো না।

সালেহা বিবি তার চুলে সিঁথি কেটে দিয়ে বললেন, ও মা, এতে কাঁদবার কী আছে। কাঁদে না মা। ছাতে যাবি না কেন, একশো বার যাবি।

হাসিনা তবুও বললো, না আর যাবো না, মা।

আপাকে কাঁদতে দেখে, গালে আঙুল পুরে দুলু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিলো। ওর দিকে চোখ পড়তে সালেহা বিবি বললেন, দেখ হাসি, দুলুটা কেমন নোংরা হয়ে আছে। ওকে একটু কুয়োতলায় নিয়ে ভালো করে চান করিয়ে দে না মা।

অন্য সময় হলে ঠোঁট বাঁকিয়ে সেখান থেকে দূরে সরে যেতো হাসিনা। এখন গেলো না। মায়ের বুক থেকে মুখ তুলে একটু হাসলো। তারপর খুশিমনে দুলুকে কুয়োতে চান করাতে নিয়ে গেলো হাসিনা।

রাতে পত্রিকা অফিসে এসে দারওয়ানের হাতে একখানা চিঠি পেলো মাহমুদ।

দারওয়ান বললো, 'এক মেমসাব দে গিয়া।'

চিঠিখানা খুলে পড়লো সে। মরিয়ম লিখেছে।

'ভাইয়া,

আজ দুদিন তুমি বাসায় এলে না। মার ভীষণ অসুখ। বারবার তোমার কথা জিজ্ঞেস করছেন। মাকে এভাবে কেন কষ্ট দিচ্ছো তুমি?

আশা করি আজ নিশ্চয় বাসায় ফিরবে।'

নিচে নিজের নাম সই করেছে।

চিঠিটা পড়ে টুকরো করে ছিড়ে ফেললো মাহমুদ। 'মা ভীষণ অসুস্থ। ইয়ার্কির আর জায়গা পায়নি' মনে মনে বললো মাহমুদ। এ শুধু ওকে বাসায় ফিরিয়ে নেবার চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। এভাবে একটা মিথ্যে কথার আশ্রয় না-নিয়ে তাকে সরাসরি বাসায় যাবার জন্যে লিখলেই তো পারতো মরিয়ম। মাহমুদ ভাবলো, রাতে বাসায় ফিরে মরিয়মকে একপ্রস্থ গালাগাল দিতে হবে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলে, সামনে একফালি সরু বারান্দা। ডান হাতে ম্যানেজারের দপ্তর। বাঁ হাতে নিউজ-সেকশনের লম্বা ঘর। টেবিলের ওপর কাগজের স্তূপ, আলপিনের বাক্স, শূন্য চায়ের পেয়ালা, পেপার কাটার আর দোয়াত কলম। একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো মাহমুদ। প্রথম প্রথম এ ঘরটিতে এসে ঢুকতে আশ্চর্য রোমাঞ্চ অনুভব করতো সে। এখন কোনো অনুভূতিই জাগে না। বরঞ্চ বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে মন। সাংবাদিক হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে আজ সে লজ্জাবোধ করে। সে তো সাংবাদিক নয়, মালিকের হাতের একটি যন্ত্রবিশেষ। কর্তার ইচ্ছেমতো সংবাদ তৈরি করতে হয়ে তাকে। তারই ইচ্ছেমতো বিকৃত খবর পরিবেশন করতে হয়। মাঝেমাঝে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে মন। তখন সে ভাবে, যদি তার টাকা থাকতো তাহলে নিজে একখানা পত্রিকা বের করতো মাহমুদ। সুস্থ সাংবাদিকতা হতো যার আদর্শ। কিন্তু এসব উদ্ভট কল্পনা, বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। প্রত্যেহ প্রয়োজন মেটানোর সামর্থ্য যার নেই, সে স্বপ্ন দেখে দৈনিক পত্রিকা বের করবার। দুত্তোর আদর্শ! পিনের বাক্সটা একপাশে ঠেলে রেখে, কলমটা হাতে তুলে নিলো মাহমুদ।

মাসখানেক পরে, একদিন সেলিনাকে পড়াতে আসার পথে দূর থেকে ওদের বাসার সামনে একটা চকোলেট রঙের নতুন গাড়ি দেখতে পেলো মরিয়ম। ভাবলো, বোধহয় নতুন কোনো অতিথি এসেছে বাসায়।

এ একমাসে বৈচিত্র্যের দিক থেকে না হলেও, ঘটনার দিক থেকে অনেক নতুন কিছু ঘটেছে তার জীবনে। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছে সে। যে-চাকরিটা হবে আশা করেছিলো, তা হয়নি। আরো দু-একটা নতুন টিউশনি পাবার আশ্বাস পেয়েছে মরিয়ম। মনসুরের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক বজায় রেখেছে সে। গত এক মাসের মেলামেশার মধ্যদিয়ে লোকটাকে কখনো খারাপ মনে হয়নি। অন্তত সে-রকম কোনো ধারণা জন্মাবার মতো ব্যবহার করেনি মনসুর। যে ক'দিন এখানে এসেছে, যাবার পথে গলির মাথা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছে মরিয়মকে। একদিন তো সে নিজেই আমন্ত্রণ করেছিলো তাকে, আসুন না আমাদের বাসায়, একটু বসে যাবেন।

না, আজ থাক। আরেকদিন যাবো। উপেক্ষা নয়, সলজ্জ সঙ্কোচে আমন্ত্রণটা এড়িয়ে গেছে মনসুর।

মরিয়ম তাতে দুঃখ পেয়েছে তা নয়। বরং সে প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করায়, নিজের দৈন্য আর প্রতিপক্ষের সচ্ছলতার কথা ভেবে অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছে মরিয়ম। যদি সে আসতো তাহলে তাকে কোথায় বসতে দিতো মরিয়ম। কী খাওয়াতো তাকে?

যে-কোনোদিন মনসুর বাসায় যাওয়ার কথা তুলতে পারে এই আশঙ্কায়, সুন্দর দেখে দুটো চায়ের কাপ আর দুটো পিরিচ কিনে রেখেছে সে বাসায়। এলে, আর কিছু না হোক এককাপ চা তো দিতে হবে। মরিয়ম আরো ভেবেছে, দুটো চেয়ার আর একটা গোল টিপয় যদি কিনতে পারে তাহলে হয়তো ভদ্রভাবে সাজানো যাবে ঘরটাকে। বাইরে থেকে কেউ এলে তাকে বসানো যাবে।

দূর থেকে মোটরটাকে দেখছিলো মরিয়ম, পাশ কাটিয়ে ভেতরে যাবার সময় আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিলো সে।

বৈঠকখানায় সবার সাথে একসঙ্গে দেখা। বাইরে বেরুবার তোড়জোড় করছিলো ওরা। সেলিনা, তার আম্মা আর মনসুর। সেলিনার বাবাকে দেখা গেলো না সেখানে। একটা ছাইরঙের প্যান্ট পরেছে আজ মনসুর। গায়ে একটা সিল্কের সাদা সার্ট। সেলিনার পরনে আকাশি রঙের শাড়ি, গায়ে বাদামি ব্লাউজ।

ওকে দেখতে পেয়ে সেলিনা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো, এই যে আপা এসে গেছে, কী মজা, এবার সবাই একসঙ্গে বেড়াতে বেরুবো আমরা।

মনসুর হাসলো। সেলিনার আম্মাও।

অপ্রস্তুত মরিয়ম তিনজনের দিকে তাকালো একবার করে। মনসুর হেসে বললো, আপনার অপেক্ষা করছিলাম আমরা। সেলিনা আজ পড়বে না। চলুন বেরিয়ে আসবেন আমাদের সঙ্গে।

সেলিনার আম্মা—আনিসা বেগমের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে মরিয়ম জানতে চাইলো, কোথায় যাচ্ছেন আপনারা ?

সেলিনা আর আনিসা বেগম দুজনে একসঙ্গে বলে উঠলো, নিউমার্কেটে। উপলক্ষটা তেমন কিছু নয়। আসার পথে বাইরে যে-গাড়িটা দেখে এসেছে মরিয়ম, কিছুদিন হলো মনসুর কিনেছে ওটা। ওর নতুন গাড়িতে করে ওদের একটু ঘুরিয়ে আনতে চায় সে।

এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেও পারবে না মরিয়ম, তা জানতো সে। তাই রাজি হয়ে বললো, আমার একটু তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরতে হবে আজ।

মনসুর বললো ঘাবড়াবেন না। ঠিক সময়ে বাসায় পৌঁছে দেবো আপনাকে।

সেলিনা অহেতুক ফিক করে হাসলো একটু। আনিসা বেগম কেন যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

গাড়িতে মনসুর আর সেলিনা সামনের সিটে বসলো। মরিয়ম আর আনিসা বেগম পেছনে।

হ্যাঁ, গত একমাসে আরো একটি সত্য আবিষ্কার করেছে মরিয়ম। একদিন কথায় কথায় আনিসা বেগম হঠাৎ প্রশ্ন করে বসেছিলেন তাকে, মনসুরকে কেমন মনে হয় তোমার মরিয়ম ?

এ ধরনের প্রশ্ন আশা করেনি মরিয়ম, তাই মুহূর্তকয়েক বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। সহসা কোনো জবাব দিতে পারেনি। ক্ষণকাল নীরব থেকে বলেছে, কেন, বেশ ভালোই তো।

আনিসা বেগমের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার উত্তর শুনে। আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে চাপাস্বরে বলেছেন, সেলিনার সঙ্গে ওকে কেমন মানাবে বলোতো ?

প্রশ্নের হেতুটা এতক্ষণে বুঝতে পেরে খানিকটা স্বস্তি পেয়েছে মরিয়ম।

কিন্তু এ-রকম কিছু একমুহূর্ত আগেও ভাবেনি সে। উপরন্তু অন্য একটি সম্ভাবনার কথা ভেবে শঙ্কিত হয়েছিলো।

উত্তরটা দিতে আবার বিলম্ব হয়েছিলো মরিয়মের, মন্দ কী ? বেশ ভালোই মানাবে ওদের।

আমারো তাই মনে হয়, আনিসা বেগম বলেছিলেন, কিন্তু কথাটা কোথাও আলোচনা করো না তুমি, কেমন ?

মরিয়ম মাথা নত করে কথা দিয়েছিলো তাকে। না, এ কথা কাউকে জানাবে না সে।

গাড়ি তখন নবাবপুর রোড ধরে এগুচ্ছিলো। দু-ধারে সার-সার বাতিগুলো একে-একে পেছনে রেখে আসছিলো ওরা। বাইরে দৃষ্টি গলিয়ে দেখছিলো মরিয়ম। আঁচলে টান পড়তে মুখ ফিরিয়ে তাকালো সে। আনিসা বেগম কিছু বলতে চান তাকে। কাছে সরে আসতে ফিসফিসিয়ে তিনি বললেন, পাশাপাশি ওদের কেমন লাগছে বলো তো?

শুনে হাসি পেলো মরিয়মের। অতি কষ্টে সামলে নিয়ে জবাব দিলো, বেশ ভালো।

আনিসা বেগম গলাটা বাড়িয়ে আরো খাটো করে বললেন, 'দুজনের গায়ের রঙ একরকম, তাই না?

মরিয়ম বললো, হ্যাঁ।

স্বভাবের দিক থেকেও বেশ মিলবে, তাই না?

হ্যাঁ।

দুজনের স্বাস্থ্য বেশ ভালো। ছেলেমেয়েগুলো রোগা লিকলিকে হবার ভয় নেই, তাই না?

'হ্যাঁ।'

আনিসা বেগম মুখখানা ধীরে ধীরে সরিয়ে নিলেন বাইরের দিকে। রমনা এলাকা অনেকটা নির্জন। দু-পাশে দোকানপাট লোকজনের ভিড় নেই। কোলাহল নেই।

জানালার পাশ ঘেঁষে বসতে একঝলক বাতাস এসে সারা মুখখানা শীতল করে দিয়ে গেলো মরিয়মের।

নিউমার্কেট এসে অনেক কেনাকাটা করলো ওরা— সেলিনা আর আনিসা বেগম। দু-খানা শাড়ি কিনলো সেলিনা। একখানা ব্লাউজ পিস। একটিন পাউডার, একটা টুথপেস্ট, কয়েকখানা সাবান কিনলো ওরা এ-দোকান সে-দোকান ঘুরে।

মনসুর একফাঁকে গলাটা নামিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কিছু কিনবেন না? মরিয়ম অন্যমনস্কভাবে একটা সেন্টের শিশি নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো, ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে বললো, না।

কথাটা কানে গেলো আনিসা বেগমের। সেলিনাসহ একটা নকল পাথরে তৈরী মালার দর করছিলেন তিনি। ওর দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, ওকি তুমি তো কিছুই কিনলে না, একটা-কিছু কেনা উচিত তোমার।

মরিয়ম নিষেধ করতে যাচ্ছিলো। একজোড়া মালা কিনে একটা ওর দিকে এগিয়ে দিলেন আনিসা বেগম, বললেন, লজ্জা করছো কেন, তুমি তো আমার মেয়ের মতো।

এ কথার পর মালাটা ফিরিয়ে দিতে পারলো না মরিয়ম। আনিসা বেগম হয়তো মনে আঘাত পাবেন।

মনসুর চুপচাপ কেনাকাটা দেখছিল ওদের। মাঝেমাঝে দু-একটা মন্তব্য করছিলো। পকেট থেকে একটা দশটাকার নোট বের করে দু-শিশি সেন্ট কিনলো সে। একটা সেলিনার জন্যে, আর একটা মরিয়মের জন্য। মরিয়মকে সরাসরি দিতে হয়তো সাহস হচ্ছিলো না। সেলিনার হাতে তুলে দিয়ে বললো, আমার তরফ থেকে এ দুটো দিলাম তোমাদের। তারপর আনিসা বেগমের দিকে তাকিয়ে বললো, খালাম্মা, আপনাকে কী দেয়া যেতে পারে বলুন তো?

আনিসা বেগম হেসে দিয়ে বললেন, না বাবা, আমাকে কিছু দিতে হবে না, আমি বুড়োমানুষ।

সেলিনা পরক্ষণে বললো, মাকে একটা চুল না-ওঠার তেল কিনে দিন, মাথার চুলগুলো উঠে যাচ্ছে ওঁর।

মেয়ের প্রতি কুপিত দৃষ্টি হানলেন আনিসা বেগম।

মরিয়মের মুখখানা অনেক আগে কালো হয়ে গেছে।

মার্কেট থেকে বেরুবার পথে মাহমুদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। বোধহয় কোনো কাজে এসেছে সে, মরিয়ম ভাবলো। চোখে চোখ পড়তে মৃদু হাসলো সে। মাহমুদের কোনো ভাবান্তর হলো না। বাকি সকলের দিকে একটি সন্ধানী-দৃষ্টি হেনে, ওর খুব কাছে এগিয়ে এসে আস্তে করে জিজ্ঞেস করলো, এরা কারা ?

ওরা তখন সামনে এগিয়ে গেছে। মরিয়ম পেছনে পড়েছিলো। একবার ওদের দিকে, আরেকবার মাহমুদের দিকে তাকিয়ে বলল, এসো না, ওদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই তোমার।

আমি আলাপ করতে চাইনে মরিয়ম। ওরা কারা তাই জানতে চেয়েছি। মাহমুদ গম্ভীর গলায় জবাব দিলো।

মরিয়ম অপ্রস্তুত গলায় বললো, একজন আমার ছাত্রী সেলিনা, আরেকজন তার মা।

আর লোকটা কে ?

সেলিনার বড় বোনের দেওর।

যাও, ওরা অপেক্ষা করছে তোমার জন্য।

মরিয়ম তাকিয়ে দেখলো, গাড়িতে বসে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই। গাড়িতে উঠতে গিয়ে সে লক্ষ করলো মনসুরের মুখখানা কেমন ভার-ভার।

বালিশে উপুড় হয়ে পড়ছিলো হাসিনা। ষান্মাসিক পরীক্ষা ঘনিয়ে এসেছে ওর। রোজ পাঠ্যবই নিয়ে বসে। প্রথমে একবার লেখাপড়ার সূচনা যারা করেছিলো তাদের একপ্রস্থ গালাগাল আর অভিশাপ দিয়ে নেয় হাসিনা, তারপর পড়তে শুরু করে।

বাসায় এসে, শাড়িটা বদলে নিয়ে, ওর কাছে এসে মরিয়ম বললো, তোমার জন্যে আজ একটা জিনিস এনেছি আমি হাসিনা।

কী, কী আপা ? বই ফেলে উঠে বসলো হাসিনা। মরিয়ম মৃদু হাসলো। তার আগে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে তোমায়।

কী প্রতিজ্ঞা ? হাসিনা ব্যগ্র গলায় জিজ্ঞেস করলো।

মরিয়ম বললো, ভালো করে লেখাপড়া করবে।

অন্য সময়ে হলে এতবড় প্রতিজ্ঞায় রাজি হয়ে যেতো না হাসিনা। কিন্তু, কিছু-একটা পাবার লোভে বিনা দ্বিধায় রাজি হয়ে গেলো।

বললো, ঠিক পড়বো দেখো, এই গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি তোমার। কী এনেছো আমার জন্য, দেখাও না আপা। আর বিলম্ব সহ্য হচ্ছিল না হাসিনার।

টেবিলের উপর থেকে পাথরের মালাটা এনে, হাসিনার হাতে গুঁজে দিলো মরিয়ম। চোখের সামনে মালাটা তুলে ধরে আনন্দে ফেটে পড়লো হাসিনা। আপাকে জড়িয়ে ধরে বললো, কী সুন্দর আপা, কী সুন্দর!

মরিয়ম বললো, দাও আমি গলায় পরিয়ে দিই।

মালাটা গলায় পরিয়ে দিলে টেবিলের ওপর থেকে কোণা-ভাঙা আয়না এনে বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজেকে দেখলো হাসিনা। খুশিতে চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার। আপার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললো, দাঁড়াও মাকে দেখিয়ে আসি, কী সুন্দর লাগছে তাই না ? নাচতে নাচতে মাকে মালাটা দেখাতে চলে গেলো সে।

সেন্টের ছোট শিশিটা টেবিলের ওপর রাখা ছিলো। হাসিনার চোখ পড়েনি ওর উপর। তাহলে এতক্ষণে বাড়িটা মাথায় তুলতো। উঠে গিয়ে সেন্টের শিশিটা চৌকির তলায় রাখা ওর টিনের বাক্সটার মধ্যে যত্ন করে রেখে দিলো মরিয়ম। হাসিনাকে ওটা দেবে না সে।

পথে আসতে আসতে আকাশে মেঘ দেখে এসেছিলো, মনে হয়েছিলো যে-কোনো সময়ে বৃষ্টি নামতে পারে। এতক্ষণে বুঝি নামলো। প্রথমে কয়েক ঝলক দমকা বাতাস, জানালার কপাট, ঘরের দেয়াল বাধা পেয়ে করুণ বিলাপের মতো শব্দ করলো। তারপর ঝিরঝির এবং ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি নেমে এলো। উঠে গিয়ে জানালার কপাটজোড়া বন্ধ করে দিলো মরিয়ম। গলির আর সব বাড়িগুলোতেও জানালা বন্ধ করার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। বউঝিদের হাঁকডাক।

আপা—আপা— ওর ঘর থেকে হাসিনার ডাক শোনা গেলো।

মরিয়ম জবাব দিলো, আসছি।

সবেমাত্র রান্নাবান্না সেরে এসেছেন সালেহা বিবি। হাসমত আলী খোকনকে পড়াচ্ছেন বসে বসে। দুলুটা ওঁর পিঠের ওপর উপুড় হয়ে আছে গলা জড়িয়ে। মাকে মালাটা দেখাচ্ছিলো আর কী যেন বলছিলো হাসিনা। মরিয়ম আসতে ওর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, এটা কত দিয়ে কিনেছিসরে আপা ?

মরিয়ম বললো, বিনে পয়সায়।

মা, বাবা, হাসিনা তাকালো ওর দিকে।

মরিয়ম আবার বললো, সেলিনার আম্মা আমাকে কিনে দিয়েছেন ওটা।

ও। হাসিনা ভ্রু কুঁচকে বললো, তাহলে তুই কিনিসনি!

সালেহা বিবি বললেন, তোকে কিনে দিয়েছেন উনি, তুই আবার হাসিনাকে দিয়ে দিয়েছিস কেন ?

মালা হারাবার ভয়ে হাসিনার মুখখানা ম্লান হয়ে এলো।

মরিয়ম বললো, কী আছে, ও পরুক না।

শুনে আবার উজ্জ্বলতা ফিরে এলো হাসিনার চিবুকে।

বৃষ্টি তখন আরো বেড়েছে। বাইরে শুধু একটানা ঝুপঝাপ শব্দ। কে যেন জোরে কড়া নাড়ছে সদর দরজায়। সালেহা বিবি বললেন, দেখতো হাসি, বোধ হয় মাহমুদ এলো।

একটু পরে ছুটতে ছুটতে হাসিনা ফিরে এসে হেসে লুটোপুটি খেলো দেখে এসো মা, ভাইয়া ভিজে একেবারে চুপসে গেছে।

সালেহা বিবি ধমকালেন, দাঁত বের করে হাসছিস কেন, এতে হাসার কী আছে।

মরিয়মের মনে পড়লো মাহমুদের ঘরে আলো নেই। দ্রুতপায়ে নিজের ঘর থেকে হ্যারিকেনটা তুলে নিয়ে ও-ঘরে রাখলো সে। ভিজে কাপড়গুলো বদলে মাহমুদ তখন গামছায় পা মুছছিলো। কাগজের স্তূপের ও পাশে রাখা হ্যারিকেনটা নিয়ে ওতে আলো জ্বেলে দিলো মরিয়ম।

কেমন করে ভিজলি, একটু কোথাও উঠে দাঁড়াতে পারলি না? মা এসে দাঁড়িয়েছেন দোরগোড়ায়।

মাহমুদ বললো, সখ করে নিশ্চয় ভিজিনি।

সালেহা বিবি বললেন, বছরের প্রথম বৃষ্টি, এ বড় খারাপ। একটু গায়ে পড়লে ঠাণ্ডা লেগে যায়। মাথার চুলগুলো মুছে নে ভালো করে।

মরিয়ম উঠতে যাচ্ছিলো। মাহমুদ বললো, কোথায় চললে, তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার, বসো।

মরিয়ম বসলো। ভেজা কাপড়গুলো নিয়ে সালেহা বিবি চলে গেলেন একটু পরে।

পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরালো মাহমুদ। তারপর বিছানার মাঝখানে আস্তে করে বসে বললো, রোজ সন্ধ্যায় তুমি কোথায় যাও তা জানতে পারি কি আমি ?

মরিয়ম অপ্রস্তুত হয়ে বললো, কেন ছাত্রী পড়াতে।

পড়ানোর কাজটা কি নিউমার্কেট সারা হয় ? মাহমুদের গলায় শ্লেষ। মরিয়ম ক্ষণকাল নীরব থেকে বললো, ওরা নিউমার্কেট যাচ্ছিল, সঙ্গে নিয়ে গেলো আমায়—।

তুমি গেলে কেন— ? ওর মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে মাহমুদ রূঢ় গলায় জবাব দিলো, ওদের সঙ্গে সম্পর্ক হলো মালিক আর মাস্টারনির সম্পর্ক। ওদের মেয়েকে পড়াও আর বিনিময়ে টাকা পাও। নিউমার্কেটে ওদের সঙ্গ দেবার জন্য নিশ্চয় কোনো বাড়তি টাকা তোমাকে দেয়া হয় না ?

মাথা নত করে চুপচাপ বসে রইলো মরিয়ম।

ওকে চুপ থাকতে দেখে হাতের বিড়িটা একপাশে সজোরে ছুড়ে মেরে মাহমুদ আবার বললো, কতদিন বলেছি, বড়লোকের বাচ্চাগুলোকে আমি দেখতে পারি না, আর তুমি ওদের সঙ্গে হাওয়া খেতে বেরোও ?

ছেলের চিৎকার শুনে সালেহা বিবি ছুটে এসে প্রশ্ন করলেন, কী হয়েছে, কিরে অমন চেঁচাচ্ছিস কেন তুই ?

হাসিনা এতক্ষণ দুয়ারের আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিলো সব। সে ফিসফিসিয়ে বললো, আপা সেলিনাদের সঙ্গে নিউমার্কেটে গিয়েছিলো, তাই ভাইয়া বকছে তাকে।

সালেহা বিবি মাহমুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, নিউমার্কেটে গেছে তাতে হয়েছে কী, এমন কী অন্যায় করেছে যে তুই বকছিস ওকে ?

তুমি যা-বোঝো না, তা নিয়ে কথা বলতে এসো না মা, কিছুটা সংযত হতে চেষ্টা করলো মাহমুদ। নিউমার্কেটে ও যাবে না কেন, একশোবার যাবে কিন্তু ওই বড়লোকদের বাচ্চাগুলোর সঙ্গে নয়।

কেন ওরা কি মানুষ না নাকি ? সালেহা বিবি ছেলের অহেতুক রাগের কোনো কারণ খুঁজে না-পেয়ে নিজেই রেগে গেলেন, ওরা যদি সঙ্গে করে নিয়ে যায় তাহলে—

কই, ওরা তো আমাকে নিয়ে যায় না ? মায়ের মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে মাহমুদ জবাব দিলো। নিউমার্কেট কেন, সদরঘাট পর্যন্তও ওরা মোটরে করে নিয়ে যাবে না আমায়। তোমার মেয়েকে দেখবে বুড়িগঙ্গার ওপারেও নিয়ে যাবে। স্বর নামিয়ে নিয়ে মাহমুদ আবার বললো, কই দশটাকা বেতন এ মাসে বাড়িয়ে দেবে বলে কথা দিয়েছিলো, বাড়িয়েছে ? ওদের আমি চিনিনে ভাবছো? সব ব্যাটা বেঈমান।

মরিয়ম তখনো মাথা নুইয়ে চুপচাপ বসেছিলো। হ্যারিকেনের আলোয় ভালো করে মুখ দেখা যাচ্ছিলো না ওর।

সালেহা বিবি ধীরগলায় বললেন, সব বড়লোক এক হয় না।

যা জানো-না তা নিয়ে কথা বলো না। এতজোরে চিৎকার করে উঠলো মাহমুদ, যে ওরা সকলে চমকে তাকালো ওর দিকে। সব বড়লোক সমান না—কটা বড়লোক তুমি দেখেছো শুনি? কোনো বড়লোকের ছেলেকে দেখেছো বি.এ. পাশ করে পঁচাত্তর টাকার চাকরির জন্যে মাথা খুঁড়ে মরতে ? কই, একটা বড়লোক দেখাও তো আমায়— যার মেয়ে অন্যের বাড়িতে ছাত্রী পড়িয়ে যে-টাকা পায় তা দিয়ে কলেজের বেতন শোধ করে ? দুপুরে রোদে একমাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে ক্লাস করতে যায় ? ওরা সমান না বললেই হলো ? সব শালা বেঈমান, চামার। বিনে পয়সায় মানুষকে খাটিয়ে মারতে চায়। দিয়েছি শালার চাকরি ছেড়ে। জাহান্নামে যাক—বলতে গিয়ে কাশি এলো তার। বিছানার ওপর উপুড় হয়ে ভয়ানকভাবে কাশতে লাগলো মাহমুদ।

পাথরের মূর্তির মতো ঠায় দাঁড়িয়ে সালেহা বিবি।

মরিয়ম নীরব।

মাহমুদ তখনো কাশছে একটানা।

ওর কাছে এগিয়ে এসে শঙ্কিত গলায় সালেহা বিবি বললেন, ঠাণ্ডা লাগেনি তো ? একটু সরষের তেল গরম করে এনে বুকে মালিশ করে দেবো ?

উঠে দাঁড়িয়ে বোধহয় তেল গরম করে আনার জন্যে বেরিয়ে গেলো মরিয়ম।

কাশি থামলে মাহমুদ বললো, আমাকে নিয়ে অত চিন্তা করতে হবে না তোমদের, এত সহজে আমি মরবো না। বলে লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো মাহমুদ।

সালেহা বিবি বল্লেন, শুয়ে পড়লি কেন ? ওঠ। যাই আমি নামাজ পড়ে ভাত দেই তোদের।

হাসমত আলী পুরোপুরি ওদের আলোচনাটা না-শুনতে পেলেও মাঝেমাঝে টুকরো কথাগুলো কানে আসছিলো তাঁর। বিশেষ করে যখন নিজের দৈন্যের কথা, সাথীহীনতার কথা বলছিলো মাহমুদ। শুনছিলেন আর মনে মনে নিজেকে বারবার অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল তাঁর। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর গুরুভার বহন করতে পারেননি তিনি। পারেননি তাদের সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেদিয়ে মানুষ করতে। তাদের শৈশব-যৌবনের আকাঙ্ক্ষাগুলোকে চরিতার্থ করতে। মনে মনে পীড়িত হচ্ছিলেন হাসমত আলী। স্ত্রীকে আসতে দেখে চাপাস্বরে শুধোলেন, কী বলছিলো মাহমুদ ?

সালেহা বিবি নামাজের যোগাড়যন্ত্র করতে করতে জবাব দিলেন, চাকরি ছেড়ে দিয়েছেও।

অনেক কথা শুনলেও খবরটি ইতিপূর্বে কানে আসেনি তাঁর। স্ত্রীর মুখে শুনে, খানিকক্ষণ একটা অর্থহীন দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। ভ্রূ-জোড়া ঈষৎ কুঁচকে এলো তাঁর। চোখজোড়া সরু হয়ে এলো। যেন কেউ শুনতে না পায় এমনি করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন হাসমত আলী।

বাইরে তখনো একটানা বৃষ্টি হচ্ছে ঝুপঝুপ শব্দে।

সালেহা বিবি সবে নামাজের নিয়ত বেঁধেছেন। হাসিনার উঁচুস্বরের ডাক শোনা গেলো ওঘর থেকে। আপা, জলদি করে আয়। পানি পড়ে বিছানাটা যে একেবারে ভিজে গেলো।

পাকঘরে বোধহয় মাহমুদের জন্যে তেল গরম করতে এসেছিলো মরিয়ম। কান খাড়া করে ওর ডাক শুনতে পেলো সে।

একটু জোরে বৃষ্টি হলে ফাটল দিয়ে ফোঁটা-ফোঁটা পানি পড়তে থাকে ঘরে। প্রতি বর্ষায় তাই বাড়িওয়ালাকে বলে মিস্ত্রি আনিয়ে ফাটল গুলো মেরামত করতে হয়। তা না হলে বর্ষার মওশুমে ঘরে থাকা দায় হয়ে পড়ে।

মরিয়ম এসে দেখলো টপটপ করে পানি পড়ে বিছানাটা বেশ ভিজে গেছে। দু-বোন দু-মাথায় ধরে চৌকিটা একপাশে সরিয়ে নিয়ে এলো। যেখানে পানি পড়ছিলো, সেখানে একটা পানির পাত্র এনে বসিয়ে দিলো মরিয়ম। হাসিনা বললো, আজ রাতে থাকবে কেমন করে?

মরিয়ম কোনো জবাব দিলো না। চৌকির এককোণে বসে পড়ে সে ভাবতে লাগলো, কবে তাদের এমন দিন আসবে যখন এ বাড়ি ছেড়ে একটা ভালো বাসায় উঠে যেতে পারবে তারা— যেখানে ছাতটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে-ভেঙে পড়বে না, মাথার উপর আর বৃষ্টির পানি তাদের চোখের ঘুম কেড়ে নেবে না? কিন্তু তেমন কোনো দিন অদূর ভবিষ্যতে দেখতে পেলো না মরিয়ম। হাতজোড়া কোলের উপর গুটিয়ে রেখে অসহায়ভাবে বসে রইলো সে। মা যখন ভাত খেতে ডাকলেন সকলকে, বৃষ্টি তখন থেমে আসছে। খাওয়া শেষ হতে অনেক রাত হয়ে গেলো।

বিছানায় শুয়ে বারবার এপাশ-ওপাশ করেছিলেন হাসমত আলী।

সালেহা বিবি শুধোলেন, কী ব্যাপার, অমন করছো কেন?

না কিছু না। আবার পাশ ফিরে শুলেন হাসমত আলী।

কিছুক্ষণ পরে তার গলার আওয়াজ শোনা গেলো। মাহমুদ হঠাৎ চাকরিটা ছেড়ে দিলো কেন?

ওকে জিজ্ঞেস করলেই পারো। সালেহা বিবি উত্তর দিলেন, অত খামখেয়ালি হলে চলে? মাসে মাসে পঁচাত্তরটা টাকা কম ছিলো কিসে। কণ্ঠস্বরে তার আক্ষেপ ধ্বনিত হলো।

হু। আবার নড়েচড়ে শুলেন হাসমত আলী। তারপর মৃদু গলায় বললেন, ছেড়ে না দিলেই ভালো করতো।

একটু পরে নীরব হয়ে গেলেন দুজনে।

সকালে ঘুম ভাঙতেই মরিয়মের মনে হলো, মাথাটা বড় বেশি ভার-ভার লাগছে ওর। গা হাত পা ব্যথা করছে। চোখের ভেতরটা জ্বলছে অল্পঅল্প। হাত বাড়িয়ে হাসিনা আছে কিনা দেখলো মরিয়ম। ও উঠে গেছে, এতক্ষণে পাশের বাড়ির বউটিকে হয়তো গলার মালাটা দেখাতে গেছে সে। মরিয়ম পাশ ফিরে শুলো।

ভালো করে আকাশটা ফরসা হবার আগেই উঠে পড়েছিলো মাহমুদ। মুখহাত ধুয়ে চা-নাস্তা খাবার আগে কাউকে-কিছু না বলে বেরিয়ে পড়লো সে। পরিচিত দু-চারজনের বাসায় গিয়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজের চাকরি ছেড়ে দেয়ার খবরটা জানালো, কোথাও কোনো কাজের সুযোগ থাকলে যেন তাকে জানানো হয়— সে অনুরোধটাও তাদের করতে ভুললো না সে। বেশি টাকার আশা করে না মাহমুদ। শ'খানেক টাকা পাওয়া যেতে পারে এ-রকমের একটা চাকরি পেলে আপাতত চলে যাবে তার।

এখানে-সেখানে ঘুরে বিশ্রামাগারের চৌকাঠে যখন পা রাখলো সে, তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে।

কেরোসিন কাঠের কাউন্টারের ওপাশে বসে হাতজোড়া সামনে প্রসারিত করে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে নঈমকে কী যেন বলছিলো খোদাবক্স। হ্যাঁ, নতুন আসছে মেয়েটা, এইতো হপ্তাখানেক হলো। একশ' টাকার মাস্টারনি—এই যে, মাহমুদ সাহেব যে, কাল কেমন ভিজলেন? কত করে বললাম, আরেকটু বসে যান, আকাশটা একটু ধরে আসুক। মাহমুদকে নীরব থাকতে দেখে খোদাবক্স তার পুরনো কথায় ফিরে গেলো। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। নতুন মাস্টারনি হয়েছে মেয়েটা। দেখতে কেমন বলছো? একেবারে আগুনের শিখা। গায়ের রঙটা? কাঁচা হলুদ দেখেছো কোনোদিন? ঠিক তার মতো। অনেক মেয়ে তো দেখলাম, অমনটি দেখিনি। একটা ঢোক গিলে খোদাবক্স আবার বললো, শরীরটা ছিপছিপে, চুলগুলো কোঁকড়ানো আর চোখ দুটো—।

দেখি আজকের খবরের কাগজটা এদিকে দাওতো।

মাহমুদের ডাকে কথার মাঝখানে হোঁচট খেলো খোদাবক্স। কাউন্টারের এককোণে রাখা খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে ওর দিকে ছুড়ে দিলো সে। তারপর আবার বললো, বসো না, চা খাও। একটু পরেই তো আসবে, দেখাবো তোমায়।

পত্রিকাটা খুলে চাকরির বিজ্ঞাপনের উপর চোখ বুলোতে লাগলো মাহমুদ। খোদাবক্সকে এখনো সে তার বেকারত্বের কথা শোনায়নি। তাহলে সে আর বাকিতে খেতে দেবে না। বলবে, এমনিতে এত টাকা জমে আছে আপনার।

হ্যাঁ, মাহমুদ সাহেব ইয়ে হয়েছে, দশটা টাকা কি এ মাস থেকে বাড়লো আপনার। খোদাবক্স প্রশ্ন করছে।

পত্রিকা থেকে মুখ না-তুলে মাহমুদ জবাব দিলো, বাড়বে, এখনো বাড়েনি। মিথ্যে কথা বলে আশু আক্রমণ থেকে মুক্তি পেলেও মনে শান্তি পাচ্ছিলো না সে।

তাহলে এ মাসে কিছু টাকা শোধ করছেন আপনি? খোদাবক্সের গলা।

তোমার কী হয়েছে বলো তো। দিনে দিনে দেখছি একটা চামার হয়ে যাচ্ছো। সকাল বেলা সবে এসেছি, অমনি টাকা-টাকা বলে চিৎকার শুরু করেছো? মাহমুদের গলাটা তিক্ততায় ভরা, টাকা শোধ করবো না বলে ভয় হচ্ছে নাকি তোমার? গরিব হতে পারি, নীচ নই, বুঝলে? যা খেয়েছি তা পাই-পাই করে শোধ করে দেব। বেঈমান ভেবো না আমাদের, বেঈমান নই। পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে রাস্তার পাশে পান-দোকানে ঝোলানো দড়িটা থেকে আগুন ধরিয়ে এনে আবার বসলো মাহমুদ।

আপনি শুধু শুধু রাগ করছেন মাহমুদ সাহেব। আমি বলছিলাম কী—।

থাক, থাক, এবার চুপ করো। ওসব কথা শুনতে ভালো লাগে না আমার। বিড়িতে একটা জোর টান দিয়ে আবার পত্রিকাটার উপর ঝুঁকে পড়লো মাহমুদ।

খদ্দেরদের রাগাতে মোটেই প্রস্তুত নয় খোদাবক্স। তাহলে ব্যবসার ক্ষতি হয়। বিশেষ করে ছোটখাটো রেস্তোরাঁ যারা চালায় তাদের পক্ষে এটা একটা অভিশাপস্বরূপ।

খানিকক্ষণ ইতস্তত করে গলাটা একেবারে খাদে নামিয়ে খোদাবক্স বললো, আপনাদের সেই ইন্টারভিউটার কী হলো মাহমুদ সাহেব?

বিড়ির ছাই ফেলতে ফেলতে মাহমুদ জবাব দিলো, কিছু হয়নি। হবে না যে জানতাম। তার গলার স্বরটা শান্ত।

শুনে আশ্বস্ত হলো খোদাবক্স। একটা খদ্দেরের কাছ থেকে চা আর টোস্টের দামটা নিয়ে ক্যাশবাক্সের মধ্যে রাখলো। তারপর সামনের রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে

রইলো খোদাবক্স। রাতে বৃষ্টি হবার পর আজকের সকালটা অন্যদিনের চেয়ে আরো বেশি উজ্জ্বল লাগছে। মেয়ে-স্কুলের লাল দালানটার গায়ে চিকচিক করছে একটুকরো রোদ। গেটের সামনে মেয়েদের বয়ে-নিয়ে আসা ঘোড়ার গাড়িগুলো একটা-দুটা করে জমা হচ্ছে এসে। একসময়ে ক্ষুদ্র চোখজোড়া বড় হয়ে এলো খোদাবক্সের। ওই যে আসছে—আসছে। চাপা উত্তেজিত গলায় বললো সে। চোখজোড়া তখনো রাস্তার উপর নিবদ্ধ তার।

ওর দৃষ্টি ধরে, মাহমুদ আর নঈম দু-জনে তাকালো সেদিক।

খোদাবক্স মিথ্যে বলেনি। গায়ের রঙটা ওর কাঁচা হলুদের মতো। চুলগুলো ঘন কালো আর কোঁকড়ানো। দেহ ছিপছিপে। সরু কোটি। চোখজোড়া ভালো করে দেখতে পেলো না মাহমুদ। খোদাবক্স মৃদু হেসে বললো, এর কথা বলছিলাম, নতুন মাস্টারনি।

লাল দালানটার ভেতরে একটু পরে অদৃশ্য হয়ে গেলো মেয়েটা। মাহমুদের মনে হলো কোথায় যেন তাকে দেখেছে সে। কোনো বাসায় ? কোনো অফিসে ? কোনো রাস্তার মোড়ে ?

খোদাবক্স বললো, ওর নাম লিলি।

মাহমুদের মনে হলো, নামটাও এর আগে কোথায় শুনেছে সে। কার মুখে যেন শুনেছিলো ? দূর তোর জাহান্নামে যাক মেয়েটা। দু-হাতে মুখখানা ঢেকে নীরবে ভাবতে লাগল মাহমুদ, কোথায় গেলে সে আশু একটা চাকুরি পেতে পারে।

দুপুরের গনগনে রোদে চোখমুখ জ্বালা করছিলো ওর। আকাশে একটুও মেঘ নেই। রাস্তার পাশে একটি-দুটি পাতাঝরা গাছ। ছায়াহীন পথ। মতিঝিলের চওড়া রাস্তাটা পেরিয়ে, শান্তিনগরে 'প্রান্তিক প্রেসে' যখন এসে পৌঁছলো মাহমুদ, তখনো সূর্যের প্রখরতা এতটুকু কমেনি।

টিনের ছাপরা দেয়া ছোট্ট প্রেস।

ছাপরার নিচে একখানা চৌকোণ টেবিলকে সামনে নিয়ে, চেয়ারে বসে শাহাদাত তালপাতার পাখায় হাওয়া দিচ্ছিলো গায়ে। ওকে দেখে পাখাটা সামনে নামিয়ে রেখে ত্রস্তপায়ে উঠে দাঁড়ালো সে। আরে, মাহমুদ যে, এসো এসো।

মাহমুদ বললো, উতলা হয়ো না, বসো। কোণায় রাখা গোল টুলটা টেনে এনে বন্ধুর মুখোমুখি বসলো সে। তারপর একটা লম্বা হাই ছেড়ে জামার বুতামগুলো একে-একে সব খুলে দিলো। পাখাটা হাতে নিয়ে জোরে বাতাস করতে করতে শুধালো, তারপর কেমন আছো বলো।

কেমন আছি জিজ্ঞেস করছো? অদ্ভুতভাবে হাসলো শাহাদাত, সুখে আছি, দিনে দিনে তলিয়ে যাচ্ছি।

মাহমুদ বিরক্তির সাথে বললো, হেঁয়ালি রাখো, আমেনা কেমন আছে ?

শাহাদাত সংক্ষেপে বললো, ভালো।

ছেলেমেয়ে ?

ভালো।

বাইরে গনগনে রোদের দিকে তাকিয়ে পাখাটা আরো জোরে নাড়তে লাগলো মাহমুদ। উপরের টিন তেতে গিয়ে গরমটা আরো বেশি করে লাগছে এখানে।

হঠাৎ শাহাদাত শুধালো, তোমার কী খবর ?

পাখা থামিয়ে মাহমুদ বললো, চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি।

ছেড়ে দিয়েছো? শাহদাত অবাক হলো, এতদিনে পারলে ছাড়তে ?

মাহমুদ বললো, ধৈর্যের একটা সীমা আছে, বুঝলে ? বলে চাকরি ছাড়ার ইতিবৃত্তটা ওকে শোনালো মাহমুদ। সাংবাদিক হবার স্বপ্ন ছিলো, সেতো চুরমার হয়ে গেছে। সাংবাদিকতার নামে গণিকাবৃত্তি করেছি এ ক-বছর। মালিকের হুকুম তামিল করেছি বসে বসে। তেলকে ঘি বলতে বলেছে, বলেছি। হাতিকে খরগোশ বানাতে বলেছে, বানিয়েছি। তবু ব্যাটারা বেঈমানি করলো। জামার কলারটা তুলে ধরে জোরে বুকের মধ্যে বাতাস করতে লাগলো মাহমুদ।

কিছুক্ষণ পর শাহাদাত আবার প্রশ্ন করলো, এখন কী করবে তুমি ?

সহসা কোনো জবাব দিতে পারলো না মাহমুদ। কী ভেবে বললো, যে-কোনো একটা চাকরি পেলে করবো। তাইতো এসেছি তোমার কাছে, যদি কোথাও কোনো প্রেসে কিছু-একটা জুটিয়ে দিতে পারো।

শাহাদাত বিব্রত গলায় বললো, আমার অবস্থা খুলে না বললেও তুমি বুঝতে পারো। কম্পিটিশনের বাজারে ভালো ক্যাপিটাল না-থাকলে বিজনেসে টিকে থাকা যায় না। প্রেসটা বোধহয় শেষে বিক্রি করে দিতে হবে। ক্ষণকাল থেমে আবার বললো, থাকগে, নিজের দুঃখের কথা বলে তোমার দুঃখের বোঝা বাড়াতে চাইনে। আমার সাধ্যিমতো চেষ্টা করে দেখবো, যদি কিছু জুটিয়ে দিতে পারি।

শেষের কথাগুলো মাহমুদের কানে গেলো কিনা বোঝা গেলা না। সামনে ঝুঁকে পড়ে অবাক কণ্ঠে সে শুধালো, প্রেসটা কি বিক্রি করে দেবে তুমি? শাহাদাতের প্রেস বিক্রি করে দেবার খবরে যেন ভীষণ আঘাত পেয়েছে সে।

শাহাদাত ম্লান হেসে বললো, কিছু টাকা যদি দিতে পারো তাহলে এ যাত্রা ঠেক দিয়ে রাখা যায়। টাইপগুলো সব পুরানো হয়ে গেছে। ওগুলো দিয়ে আর কাজ চালানো যাচ্ছে না। নতুন টাইপ না-কিনলে লোকে এখানে ছাপাতে আসবে কেন? তাছাড়া শহরে এখন অনেক অভিজাত ছাপাখানা হয়ে গেছে—তাদের পাশে আমার টিনের ছাপরাটা কি হাস্যকর নয় ? কথা শেষে আবার হাসলো শাহাদাত।

মাহমুদ ততক্ষণে গম্ভীর হয়ে গেছে। মাস-কয়েক আগে বউ-এর অলঙ্কার বিক্রি করে টাইপ কেনার টাকা সংগ্রহ করেছিলো শাহাদাত। সে-খবর মাহমুদের অজানা নয়। সে টাকা তবে কী করেছে সে ? জুয়োর আড্ডায় সব উড়িয়েছো বুঝি ?

শাহাদাত চমকে বললো, কী?

আমেনার অলঙ্কার বেচা টাকাগুলো ?

শুনে বিমর্ষ হলো শাহাদাত। ইতস্তত করে বললো, পাগল হয়েছো ? জুয়োর আড্ডায় উড়োব, পাগল হয়েছো ?

থাক, আমি তোমার কাছে কৈফিয়ত চাইনি, পাখাটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে মাহমুদ বললো, আমেনা আছে কি ভেতরে ?

প্রসঙ্গটা আপনা থেকে ঘুরিয়ে নেয়ায় খুশি হলো শাহাদাত। বললো, না, ও ওর এক খালার বাড়ি গেছে, এইতো কমলাপুর। বসো, এক্ষুনি এসে যাবে।

মাহমুদ বললো, না, আমি আর বসবো না। বেলা অনেক হয়ে গেছে, এবার উঠি।

শাহাদাত বললো, কোথায় যাবে ?

বাসায়।
আরেকটু বসো না, এককাপ চা খেয়ে যাও।
না, এখন চা খাবো না।
আবার সেই গনগনে রোদের সমুদ্রে নেমে এলো মাহমুদ। পেছন থেকে শাহাদাতের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, আবার এসো কিন্তু।

সেই-যে সকালে মাথা ধরেছিলো মরিয়মের, তারপর দুটো দিন বিছানা ছেড়ে আর উঠতে পারলো না সে। সারা গা কাঁপিয়ে জ্বর এলো। সারা দেহে অসহ্য যন্ত্রণা।
এখনো গায়ে জ্বর আছে অল্প-অল্প। ডাক্তারের কাছ থেকে মিকচার এনে খাইয়েছেন হাসমত আলী। মাথার পাশে বসে কপালে জলপট্টি দিয়েছেন সালেহা বিবি। হাসিনা গা-হাত টিপে দিয়েছে ওর।
শরীরটা ভয়ানক দুর্বল বোধ হলেও এখন অনেকটা সুস্থ মরিয়ম।
জানালা গলিয়ে একঝলক রোদ এসে পড়েছে ঘরের কোণে, যেখানে কটা মাকড়সা জাল বুনছে আপন মনে। সুড়কি-ঝরা লাল দেয়ালটা জুড়ে সাদা পাতলা আলোর জাল। চোখের পাতাজোড়া বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে রইলো মরিয়ম। সালেহা বিবি কখন এ ঘরে এসেছেন টের পায়নি সে। কপালে একখানা হাত রেখে দেহের উত্তাপ নিলেন তিনি। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, একবাটি বার্লি বানিয়ে দিই, কেমন?
মায়ের হাতের ওপর ডান হাতখানা রেখে অস্পষ্ট স্বরে মরিয়ম বললো, খেতে ইচ্ছে করে না মা।
না খেলে যে শরীরটা আরো দুর্বল হয়ে পড়বে। সালেহা বিবির কণ্ঠ কোমলতায় ভরা, বানিয়ে আনবো?
আনো মা। ক্ষীণ গলায় জবাব দিলো মরিয়ম।
একটু পরে ওর গায়ের কাপড়টা ভালোভাবে টেনে দিয়ে চলে গেলেন মা। তার পায়ের লঘু শব্দটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো দূরে।
কোথায় একটা কাক ডাকছে কা কা করে। এইমাত্র একটি চিল ডেকে গেলো। গলিতে বুঝি কোনো ছেলে টিন পিটিয়ে খেলা করছে। কারা কথা বলছে ও-বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সব শুনছিলো মরিয়ম।
আপা! দোরগোড়ায় হাসিনার গলা, একটা লোক আসছে, তোর কাছে দেখা করতে চায়।
জ্বরের মধ্যেও চমকে উঠলো মরিয়ম।
হাসিনা কাছে এসে বললো, ভেতরে নিয়ে আসবো?
হাতের ইশারায় ওকে আরো কাছে ডেকে মরিয়ম শুধালো, নাম জিজ্ঞেস করেছিস লোকটার?
হাসিনা মাথা নাড়লো, না। তারপর নাম জিজ্ঞেস করার জন্য বোধহয় আবার ফিরে যাচ্ছিলো হাসিনা।
মরিয়ম ক্ষীণ গলায় ডাকলো, হাসিনা এই শোন।
হাসিনা ফিরে দাঁড়ালো।

মরিয়ম বললো, মায়ের ঘর থেকে চেয়ারটা এনে এখানে রাখ। টেবিলের উপর বইগুলো বড্ড অগোছালো হয়ে আছে। হ্যাঁরে হাসিনা, বাবা আছেন ঘরে ?

হাসিনা ঘাড় নাড়ালো, না।

ভাইয়া ?

না।

ইশারায় লোকটাকে ভেতরে নিয়ে আসতে বলে কাঁথাটা সারা গায়ে ভালো করে জড়িয়ে নিলো মরিয়ম।

প্রথমে মায়ের ঘর থেকে চেয়ারটা এ-ঘরে রেখে গেলো হাসিনা। তারপর লোকটাকে নিয়ে এলো।

মরিয়ম যা আশঙ্কা করেছিলো—মনসুর।

এ কী ? ঘরে ঢুকে ওর দিকে চোখ পড়তেই দাঁড়িয়ে পড়লো মনসুর। আপনার অসুখ করেছে নাকি? ওর কণ্ঠস্বরের এই ব্যগ্রতায় বিব্রতবোধ করলো মরিয়ম। দৃষ্টিটা ওর পায়ের পাতার কাছে নামিয়ে এনে আস্তে করে বললো, বসুন।

মনসুর বসলো।

হাসিনা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিলো। মাকে একটা নতুন লোক আসার খবরটা দেবার জন্য বোধহয় চলে গেলো সে।

মরিয়ম তাকালো ওর দিকে।

একজোড়া গভীর সহানুভূতি-ভরা চোখ চেয়ে-চেয়ে দেখছে তাকে।

মরিয়ম বললো, তারপর কেমন আছেন ?

ওর প্রশ্ন, খুশির আবির ছড়িয়ে দিলো মনসুরের চোখেমুখে। ডানহাতের তর্জনী দিয়ে বাঁ হাতের তালুটা ঘষতে ঘষতে সে জবাব দিলো, আমি ভালো আছি। আপনার অসুখ হয়েছে খবরটা জানতে পেলে আরো আগে দেখতে আসতাম। দু-দিন ও-বাসায় আপনি গেলেন না, ভাবলাম, কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছে। মনসুর থামলো। শান্ত স্নিগ্ধ ও গভীর দৃষ্টি নিয়ে সে তাকালো মরিয়মের দিকে।

মরিয়ম ইতস্তত করে বললো, এখন জ্বর প্রায় ছেড়ে গেছে। দু-একদিনের মধ্যে ভালো হয়ে যাবো।

মনসুর বললো, দু-দিনের জ্বরে আপনি ভীষণ শুকিয়ে গেছেন।

রোগপাণ্ডুর মুখখানা ঈষৎ আরক্ত হলো মরিয়মের। ইচ্ছে হচ্ছিলো, গায়ের কাঁথাটা দিয়ে মুখটা ঢেকে ফেলে তার। হাসিনা এসে এই বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে মুক্তি দিলো তাকে।

মরিয়ম বললো, ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছে আপনার ? আমার ছোট বোন হাসিনা।

মনসুর ফিরে তাকালো ওর দিকে। মৃদু হাসলো, তারপর বললো, উনিই তো ভেতরে এনেছেন আমায়।

হাসিনা চুপচাপ হাতের নখ খুঁটতে লাগলো। মরিয়ম দেখলো, মা দূর থেকে উঁকি মেরে একবার মনসুরকে দেখে চলে গেলেন। হাসিনাও গেলো তার পিছুপিছু। শায়িত অবস্থায়, ওর দিকে না-তাকিয়েও মরিয়ম বুঝতে পারছিলো, একজোড়া সহানুভূতি-ভরা শান্ত চোখ গভীর দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে-চেয়ে দেখছে তাকে। অকারণে আরেকবার আরক্ত হলো মরিয়ম। কিছু না-বলে নীরব থাকাটাও অস্বস্তিকর মনে হলো। অথচ কী যে আলোচনা করা যেতে পারে, কিছু খুঁজে পেলো না। 'হ্যাঁ, সেলিনা কেমন আছে ?' একটা-কিছু আলোচনার বিষয়বস্তু পেয়ে আসন্ন বিপদমুক্ত হলো মরিয়ম।

মনসুর বললো, ভালো।

তারপর আবার নীরবতা।

এবার উঠি তাহলে। নীরবতা গুঁড়িয়ে বললো মনসুর, একটা কাজ আছে যাই এখন। আবার আসবো।

না না, যাবেন আর কি, আরেকটু বসুন। ক্ষীণ গলায় বললো মরিয়ম। বলে দরজা লক্ষ করে তাকালো সে—যদি হাসিনাকে দেখা যায়। মনসুরকে চা-নাস্তা করানো উচিত এবং মা নিশ্চয় তার যোগাড়যন্ত্র করেছে।

মরিয়মের অনুমান মিথ্যে নয়। একটু পরে, কিছুদিন আগে কেনা চায়ের কাপে চা আর একটা পিরিচে দুটো পান্তুয়া আর দুটো সন্দেশ সাজিয়ে নিয়ে এলো হাসিনা। টেবিলের ওপর ওগুলো নামিয়ে রাখলো সে।

মরিয়ম বললো, একগ্লাস পানি দিয়ে যাও হাসি।

মনসুর একবার টেবিলের দিকে, আরেকবার মরিয়মের দিকে তাকিয়ে নীরব রইলো।

মরিয়ম ওর দিকে কাত হয়ে শুয়ে বললো, আমরা গরিব। বিশেষ কিছু খাওয়াতে পারব না আপনাকে,— এককাপ চা খান। বলতে গিয়ে আবার আরক্ত হলো মরিয়ম। কিন্তু মনসুর গম্ভীর হয়ে গেছে, মুখখানা কালো হয়ে আসছে তার। কপালে বিন্দুবিন্দু ঘাম জমেছে এসে।

চা-নাস্তা খেয়ে আবার আসবে বলে চলে গেলো মনসুর।

ও চলে গেলে অনেকক্ষণ কেন যেন খুব ভালো লাগলো মরিয়মের। সকালে ঘুম ভাঙার পর যে ক্লান্তিবোধ করছিলো তা আর এখন নেই। বাইরে কোনো পরিবর্তন হয়নি। গায়ে জ্বর এখনো। তবু একটা আনন্দের আভা জেগে উঠেছে তার দু-গালে। বেশ সুস্থ মনে হচ্ছে নিজেকে। গায়ের উপর থেকে কাঁথাটা সরিয়ে দিয়ে, চোখ বুজে মনসুরের কথা ভাবতে লাগলো মরিয়ম।

কে এসেছিলোরে মরিয়ম ? মায়ের কণ্ঠস্বর। হাতে একগ্লাস বার্লি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

মরিয়ম বললো, সেলিনার বড় বোনের দেবর। বার্লির গ্লাসটার জন্য হাত বাড়িয়ে জবাব দিলো মরিয়ম। সে ভেবেছিলো, মা কিছু বলবেন। কিন্তু সালেহা বিবি আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে মরিয়ম বুঝতে পারলো, সালেহা বিবি লোকটার আগমনে সুখী হতে পারেননি। কে জানে, হয়তো জাহেদের কথা মনে পড়ে গেছে তার। কিন্তু সব পুরুষ কি একরকম ? বার্লির গ্লাস হাতে ভাবলো মরিয়ম। মনসুরকে জাহেদের মতো বলে ভাবতে কোথায় যেন একটা যন্ত্রণা অনুভব করলো সে।

লোকটা করে কী ? এতক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন সালেহা বিবি।

বার্লিটা খেয়ে নিয়ে মরিয়ম জবাব দিলো, ব্যবসা করে।

কিসের ব্যবসা ?

জানি না।

মা চলে গেলে অনেকক্ষণ মরিয়ম ভাবলো, মনসুরকে বলে দিলেই হতো সে যেন আর না আসে।

বিকেলে আবার এলো মনসুর।

একবোতল হরলিক্স আর একঠোঙা আঙুর-বেদানা হাতে। সসঙ্কোচে ওগুলো টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো সে। মরিয়মের দিকে সরাসরি তাকাতে সাহস পেলো না।

মরিয়ম অস্ফুটস্বরে বললো, ওখানে কী ?

মনসুর সলজ্জ গলায় বললো, একটা হরলিক্স আর কিছু ফ্রুটস।

কেন এনেছেন শুধুশুধু ? আর বেশি কিছু বলতে পারলো না মরিয়ম। মনে-মনে ওর প্রতি ভীষণ রাগ হচ্ছিলো তার। কিন্তু তা প্রকাশ করতে পারলো না। একজোড়া সহানুভূতিপূর্ণ লজ্জাবনত চোখের দিকে তাকিয়ে সব ভুলে গেলো সে। সকালে এনে-রাখা চেয়ারটা দেখিয়ে শুধু বললো, বসুন।

বাসায় বাবা আর মাহমুদ দু-জনে আছেন এখন। তাদের কথা ভেবে শঙ্কিত হলো মরিয়ম। তারা নিশ্চয়ই মনসুরের এই আসা-যাওয়া শুভ চোখে দেখবে না। জাহেদকে এত সহজে ভুলতে পারে না ওরা। মরিয়মও ভুলেনি।

এখন কেমন আছেন ? গলার স্বরে উৎকণ্ঠা। কনুই-এর উপর ভর দিয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করলো মরিয়ম। ক্ষীণ গলায় বললো, ভালো।

মনসুরকে এখন বিদায় দিতে পারলে বাঁচে সে। রোগাক্লিষ্ট দেহে কোনোরকমে অপঘাত সহ্য করতে পারবে না। বাবা মনে-মনে রাগ করলেও মুখে কিছু বলবে না। কিন্তু মাহমুদ হয়তো প্রকাশ্যে অপমান করে বসবে, আর তা খুব সুখপ্রদ হবে না মরিয়মের কাছে।

কেমন আছিস মা ? বাবা এখন আসবেন তা জানতো মরিয়ম। মুহূর্তে সারা গাল রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। তার হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে এসে যেন শ্বাসরোধ করে দাঁড়ালো।

মনসুরকে দেখে বিব্রতবোধ করলেন হাসমত আলী।

মরিয়ম অস্ফুটস্বরে বললো, বাবা !

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, ওদের দুজনকে চমকে দিয়ে , হাসমত আলীর পা ধরে সালাম করলো মনসুর। ডানহাতখানা সামনে বাড়িয়ে ইতস্তত করে হাসমত আলী বললেন, থাক।

নিজের নাম আর পরিচয় শেষে শূন্য চেয়ারটা হাসমত আলীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মনসুর বললো, বসুন। যেন ঐ বাড়িকর্তা। হাসমত আলী মেহমান হিসেবে এসেছেন।

মনসুরের ব্যবহারে দুজনে ওরা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে গেলো।

হাসমত আলী বললেন, না, না, আমি বসবো না, আপনি বসুন।

মনসুর বসলো না—দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর অত্যন্ত সহজভাবে হাসমত আলীর সঙ্গে মরিয়মের চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা করলো সে। একটা ভালো ডাক্তার দেখানো উচিত। কিছু টনিক খাওয়ালে শারীরিক দুর্বলতা আর থাকবে না, তাও বললো মনসুর। বিব্রতবোধ করলেও অপ্রসন্ন যে হননি হাসমত আলী, সেটা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো মরিয়ম। একটু আগের সকল শঙ্কা দূর হয়ে গিয়ে হালকা বোধ করলো সে।

পরদিন আবার এলো মনসুর।

পরদিন

তার পরদিনও।

তারপর থেকে নিয়মিত ওদের বাসায় আসতে লাগলো মনসুর। বাবা, হাসিনা, সালেহা বিবি, খোকন, দুলু— সকলকে কী এক অদ্ভুত জাদুবলে আপনার করে নিলো সে। মরিয়ম নিজেও বুঝতে পারলো না, কেমন করে এটা সম্ভব হলো। স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের মতো, সমস্ত পরিবারটাকে দুর্বার বেগে তার কাছে টেনে নিয়ে এলো মনসুর। হাসমত আলীকে বাবা বলে সম্বোধন করলো সে। সালেহা বিবি মা। খোকনকে একটা ফুটবল কিনে দিলো, দুলুকে একটা প্লাস্টিকের পুতুল। হাসিনার জন্য ওর পছন্দমতো একটা শাড়ি কিনে আনল—আর মরিয়মের জন্য নানারকম টনিক, ফ্রুটস, আর হরলিক্স।

দারিদ্র-বিধ্বস্ত পরিবারে খোদার ফেরেস্তা হিসেবে আবির্ভূত হলো মনসুর। কোনোদিন ও না-এলে মা চিন্তিত হয়ে শুধান— কিরে, মনসুরটা তো আজ এলো না। অসুখ-টসুখ করেনি তো ওর?

বাবা বলেন, আসবে, বোধহয় কোনো কাজেটাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আহা, বড় ভালো ছেলে! জীবনে কত দেখলাম, এমন নম্র আর ভদ্র ছেলে দেখিনি।

খোকন ফুটবলটা দু-হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে প্রশ্ন করে, মনসুর ভাই আজ আসবে না আপা?

হাসিনা বলে, সত্যি, উনি না-এলে কিচ্ছু ভালো লাগে না।

কোনো মন্তব্য করে না শুধু একজন। সে মাহমুদ। ভোরে ঘুম থেকে উঠে নির্বিকার নির্লিপ্ততায় বাইরে বেরিয়ে যায় সে। সারাদিন আর ফেরে না। ফেরে রাত বারোটায়। কোনোদিন খায়, কোনোদিন না-খেয়ে শুয়ে থাকে। বাসার কাউকে মুখ দেখাতে যেন লজ্জাবোধ করে সে। তাই সকালে ঘুম ভেঙে ওঠার আগে বেরিয়ে যায়—আবার সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তবে বাসায় ফেরে।

মনসুর দু-একদিন জিজ্ঞেস করেছিলো ওর কথা।

সালেহা বিবি হতাশ গলায় বলেছেন, ওর কথা আর বলো কেনো বাবা? বাসার খোঁজখবর কি রাখে ও? সারাটা দিন কী চিন্তায় যে ঘুরে বেড়ায়, খোদা জানে।

হাসিনা বলে, ভাইয়াটা দিন দিন বাউণ্ডুলে হয়ে যাচ্ছে।

হাসিনা। মরিয়ম শাসানো-দৃষ্টিতে তাকায় ওর দিকে।

হাসিনা বলে, বাউণ্ডুলে নয় তো কি? ভাইবোনগুলোর একটু খোঁজখবর নেয় কোনোদিন?

মরিয়ম বলে, ও কথা বলতে নেই হাসিনা।

হাসিনা চুপ করে যায়।

মরিয়ম এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। বিছানা ছেড়ে এ-ঘরে ও-ঘরে চলাফেরা করে সে। বাইরে বেরুতে চেয়েছিলো। কিন্তু মনসুরের কড়া নিষেধ। জ্বর ছাড়লে কী হবে, আবার আসতে পারে। শরীরটা সম্পূর্ণ সুস্থ না হলে বাইরে বেরুনো চলবে না।

মরিয়ম বলে, এখন তো কোনো অসুখ নেই। আমি সত্যি ভালো হয়ে গেছি।

মনসুর বলে, আরো ক'টা দিন যাক।

মরিয়ম বলে, সেলিনার নিশ্চয় পড়ার খুব ক্ষতি হচ্ছে?

মনসুর বলে, ঘাবড়াবার কিছুই নেই, আপনার চাকরি যাবে না। ওদের বলে দিয়েছি আমি, আপনার অসুখ।

মরিয়ম বলে, সত্যি আপনার কাছে অনেক ঋণী হয়ে রইলাম।

একটু ইতস্তত করে মনসুর বলে, ভালো হয়ে নিন, একদিন নাহয়, এ ঋণ শোধ করার সুযোগ দেয়া যাবে আপনাকে।

বুকটা ধড়াস করে ওঠে মরিয়মের। চোখ তুলে ওর দিকে আর তাকাতে পারে না সে। বুকের কাছে কোথায় যেন একটু ভয়, একটু আনন্দ মিশে গিয়ে এক অপূর্ব অনুভূতির সৃষ্টি করে।

একদিন হাসিনা আর খোকনকে নিয়ে বেড়াতে বেরুলো মনসুর। মা-কেও যেতে বলেছিলো। মা বললেন, আমি বুড়ো মানুষ, তোমরা যাও।

মনসুরের কিনে-দেয়া শাড়িখানা পরে, গলায় সেই পাথরের মালাটা জড়িয়ে বেরিয়ে যাবার সময় মরিয়মকে লক্ষ করে বলে গেছে হাসিনা— তুই বিছানায় শুয়ে থাক্ আপা, আমরা চললাম বেড়াতে। কি, খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি ? মুচকি হেসে খোকনের হাত ধরে মনসুরের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে সে। ফিরে এসে উল্লাসে ফেটে পড়েছে হাসিনা।

মনসুর মোটরে করে পুরো রমনাটা ঘুরিয়েছে ওদের। রেসকোর্স, সারপেন্টাইন লেক, আজিমপুর, মতিঝিল, কত জায়গায় গেছে। কী সুন্দর মনসুর ভাইয়ের মোটরটা ! মাঝে মাঝে খুব জোরে চালাচ্ছিলো আর এমন ভয় হচ্ছিলো আমার আপা !

হাসিনা বললো, খোকন বারবার পিপ পিপ করে হর্ন দিচ্ছিলো, এত ভালো লাগছিলো আমার, বলতে গিয়ে সারা চোখমুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলো তার, কসবা রেস্টুরেন্টে ঠাণ্ডায় গা কাঁপে। মনসুর ভাই ওখানে নিয়ে গিয়ে পরটা, কাবাব খাওয়ালেন। তারপর গলির মাথায় আমাদের নামিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার আপা ভালো হলে সবাইকে নিয়ে আরেক দিন বেড়াতে বেরুবো। কী মজা, তাই না আপা ? মরিয়মকে জড়িয়ে ধরে খুশিতে লুটোপুটি খেলো হাসিনা।

শুধু তখন নয়, পড়তে বসে, খাওয়ার সময়, শোবার আগখান দিয়েও কোথায় কোথায় গিয়েছিল আর কী কী দেখেছে—সে-সব কথা সকলকে শুনালো হাসিনা। বারবার মনসুরের প্রশংসা করলো। ওর মতো এত ভালো লোক এ জীবনে সে দেখেনি আর। মনসুর ভাই দেখতেও খুব সুন্দর—তাই না আপা ?

চমকে হাসিনার দিকে তাকালো মরিয়ম। কটাকটা চোখজোড়া স্বপ্নময়। আনন্দে চিকচিক করছে যেন।

তোমার কী হয়েছে হাসিনা ? মনে মনে বললো মরিয়ম। জাহেদের কথা এ মুহূর্তে মনে পড়লো তার আর নিজের প্রথম যৌবনের কথা। খানিকক্ষণ সে শুধু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলো তাকে। এত প্রগলভতা কেন হাসিনার ?

নিজেকে প্রশ্ন করলো মরিয়ম। হাসিনার প্রতিটি গতিবিধি, কথাবার্তা আশঙ্কাজনক বলে মনে হলো তার।

রাতে ভালো ঘুম হলো না মরিয়মের।

পরদিন সকালে অন্যদিনের মতো বেরিয়ে গেল না মাহমুদ। বেশ বেলা করে ঘুম থেকে উঠলো সে। কুয়োতলায় বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত মাজলো, মুখ হাত ধুলো। তারপর মায়ের ঘরে চা-নাস্তা করতে বসে খবরটা জানালো সে। নতুন একটা চাকরি হয়েছে তার। প্রেসে প্রুফ-রিডারের চাকরি। মাসে নব্বই টাকা করে দেবে।

মেঝেতে চাটাই বিছিয়ে গোল হয়ে বসে চা খেতে বসেছিলো সবাই। মুখ তুলে একবার করে তাকালো ওর দিকে।

সালেহা বিবি প্রথম কথা বললেন, রাত জেগে করতে হবে নাতো ?

মাহমুদ বললো, রাতদিন ঠিক নেই, যখন দরকার হবে তখনি করতে হবে কাজ।

সালেহা বিবি বললেন, এ আবার কেমনতরো চাকরি।

আর কেউ কোনো মন্তব্য করলো না।

একমুখ মুড়ি চিবোতে চিবোতে হাসিনা বললো, মনসুর ভাইকে বললে উনি আরো একটা ভালো চাকরি জোগাড় করে দিতেন তোমায়।

মনসুর ভাইটা আবার কে ? যেন কিছু জানে না এমনিভাবে সবার দিকে তাকালো মাহমুদ।

মরিয়ম যে মেয়েটাকে পড়ায় তার বড় বোনের দেবর। সালেহা বিবি জবাব দিলেন ক্ষণকাল পরে— তোমার সঙ্গে কি আলাপ হয়নি তার ? হবেই বা কেমন করে, তুমি কি আর বাসায় থাকো ?

এ ফাঁকে সেখান থেকে সরে পড়লো মরিয়ম।

হাসিনা ডাকলো— চা না খেয়ে চলে যাচ্ছিস কেন আপা।

মরিয়ম বললো, আসছি। কিন্তু সে আর এলো না।

মুখেপোরা মুড়িগুলো গিলে নিয়ে মাহমুদ বললো, 'বাসায় না থাকলে কী হবে, কোথায় কী হচ্ছে সে খোঁজ আমি রাখি, মা। টাকার জন্যে যে তোমরা আত্ম বিক্রি করছো তা আমি জানি।

সকলে চুপ।

মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেও ছেলের কথার জবাবে কিছু বলতে সাহস পাচ্ছিলো না হাসমত আলী।

হাসিনা অবাক হয়ে তাকালো মাহমুদের দিকে। এ কথার কোনো অর্থ বোধগম্য হয়নি তার।

সালেহা বিবি ইতস্তত করে বললেন, যা মুখে আসে তা পট করে বলে বসিস না বুঝলি ? একটু চিন্তা করিস।

মাহমুদ পরক্ষণে জবাব দিলো, 'চিন্তা করার কথা আর কেন বলছো মা। লোকটার যদি টাকাপয়সা না থাকতো, সে যদি তোমার ছেলেমেয়েদের জন্যে এটা-সেটা কিনে এনে না দিতো তাহলে কি আর তাকে অমন মাথায় তুলে নাচতে তোমরা। মায়ের কাছ থেকে কোনো উত্তর অপেক্ষা না করে উঠে দাঁড়ালো মাহমুদ। নিজের ঘরে চলে যাবার আগমুহূর্তে বলে গেলো— চাটা আমার ঘরে দিয়ে যাসতো হাসিনা।

ও চলে গেলে হাসিনা মুখ বিকৃত করে বললো, ভাইয়াটা যে কী, মিছেমিছি অন্য লোককে গালাগাল দেবে, নিজে যেন কত বড় হয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত একটা শাড়ি কিনে দিতে পারলো না আমায়, মুখে শুধু বড় বড় কথা।

ওই কথা বলে বলেই তো গেলো, যোগ করলেন সালেহা বিবি।

খোকন বললো, মনসুর ভাই কখন আসছেন ?

সে কখন আসবে তাতে তোমার কী ? হাসমত আলী খেঁকিয়ে উঠলেন, ওসব বাজে কথা ছেড়ে বই নিয়ে পড়তে বসো। উষ্মা বিরক্তি বিতৃষ্ণা।

সালেহা বিবি বললেন, ও কী করেছে যে ওকে অমন ধমকাচ্ছো তুমি ?

হাসমত আলী বললেন, আজকাল পড়ালেখা কিছু করে ও ? সারাদিনতো ঐ ফুটবলটা নিয়ে আছে।

ছেলেমানুষ একটু খেলাধুলা করবে নাতো কি? সালেহা বিবি জবাব দিলেন— তুমি শুধু-শুধু ওকে অমন করে ধমকিয়ো না। চায়ের বাটি আর মুড়ির থালাগুলো হাতে নিয়ে পাকঘরে চলে গেলেন তিনি।

বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে একটা বই পড়েছিলো মাহমুদ। চায়ের কাপটা পাশে নামিয়ে রাখতে বইটা বন্ধ করে বললো, হাঁরে হাসি, ধর আমি যদি একটা বড় চাকরি করতাম, মাসে মাসে যদি শ'পাঁচেক টাকা আয় হতো আমার, আর তোদেরকে যদি রোজ বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেতাম, এটা-সেটা কিনে দিতাম— তাহলে তোরা আমাকে খুব ভালোবাসতি তাই না?

হাসিনা বুঝলো না। অবাক হয়ে মাহমুদের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো সে। তারপর ফিক করে হেসে দিয়ে বললো, তুমি পাঁচশো টাকা আয় করতে পারলে তো। বলে ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে গেলো সে।

অপমানিত বোধ করলো মাহমুদ। সেও পুরুষ। পাঁচশো টাকা আয় করার মতো সামর্থ্য কোনোদিন হবে না। হবে না এ জন্যে যে—তার শক্তি নেই, ক্ষমতা নেই, যোগ্যতা নেই। হবে না এ জন্য যে—তার কোনো বড়লোক হিতৈষী নেই, মন্ত্রী নেই, আত্মীয় নেই, অসৎপথে অর্থ রোজগারের প্রবৃত্তি নেই। মরিয়ম। হঠাৎ চিৎকার করে ডাকলো সে— মরিয়ম। প্রথম তার কোনো জবাব এলো না। দ্বিতীয় ডাকের একটু পরে মরিয়ম সশরীরে এসে হাজির—আমায় ডেকেছো?

হ্যাঁ, বসো, এক চুমুকে চায়ের কাপটা শূন্য করে একটা বিড়ি ধরালো মাহমুদ। তুমি কী করবে ঠিক করেছো?

মরিয়ম ইতস্তত করে বললো, এখনো কিছু ঠিক করিনি।

মাহমুদ বললো, কেন, ওই বড়লোকটার গলায় ঝুলে পড়লেই তো পারো, মন্দ কী? তীর্যক কণ্ঠস্বর।

মরিয়মের ইচ্ছে হচ্ছিলো মাটির সঙ্গে মিশে যেতে। ক্ষোভে, দুঃখে, লজ্জায় চোখমুখ জ্বালা করে উঠলো তার। এ সময়ে হাসিনা না এলে হয়তো কেঁদে ফেলতো মরিয়ম।

হাসিনা দরজার ওপাশ থেকে বললো, কে এসেছে দেখে যা আপা।

ওর উচ্ছ্বাস দেখে প্রথমে মরিয়মের মনে হয়েছিলো মনসুর। আর তাই মনে ভীষণ বিব্রতবোধ করছিলো সে।

হাসিনা বললো, লিলি আপা এসেছে।

মরিয়ম হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

মাহমুদ বললো, তোমার সঙ্গে কথা কিন্তু শেষ হয়নি আমার। বান্ধবীকে বিদায় দিয়ে আবার এসো।

লিলি একা আসেনি, সঙ্গে তার একটা সতেরো-আঠারো বছরের ছেলে। হাতে একটা ক্যামেরা। লিলি পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো, আমার মামাতো ভাই তসলিম, ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। হাসিনা ফটো তুলবে বলেছিলো, তাই ওকে নিয়ে এসেছি।

হাসিনা খুশিতে ডগমগ হলো।

মরিয়ম বললো, তোমাকে আরো আগে আশা করেছিলাম লিলি। এতদিন আসোনি কেন?

লিলি বললো, সারাদিন ছাত্রী পড়িয়ে বিকেলে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।

মরিয়ম বললো, আমার অসুখ করেছিলো, যদি মরে যেতাম !

লিলি অবাক হলো—অসুখ হয়েছিলো ? আমাকে একটু খবর দিলেই তো পারতে, আমি কিচ্ছু জানি না।

মরিয়ম বললো, কার হাতে খবর পাঠাবো ?

লিলি বললো, তোমার দাদাকে তো প্রায়ই দেখি, আমাদের স্কুলের সামনে একটা রেস্তোরাঁয় বসে বসে আড্ডা দেন। তার হাতে খবর পাঠালে পেতাম।

মাহমুদ সম্পর্কে লিলির মন্তব্যটা ভালো লাগলো না মরিয়মের।

হাসিনা বললো, দেখলি তো আপা, ভাইয়া সারাদিন রেস্টুরেন্টে বসে আড্ডা মারে, তাইতো বাসায় বেশি খায় না।

বাজে বকো না হাসিনা। মরিয়ম ধমকে উঠলো।

মুহূর্ত-কয়েক আবহাওয়াটা গুমোট হয়ে রইলো।

অবশেষে পরিবেশটা হালকা করে লিলি বললো—চলো ফটো তুলবে।

হাসিনা হাততালি দিয়ে বললো, চলো আপা, ভাইয়াকে ডাকবো ?

তারপর তসলিমের দিকে চেয়ে বললো, আমার একটা ভালো ফটো তুলে দিতে হবে কিন্তু।

আপনারা কি গ্রুপফটো তুলবেন, না প্রত্যেকে আলাদা করে। তসলিম এতক্ষণে কথা বললো, আমার কাছে কিন্তু বেশি ফিল্ম নেই।

ফিল্ম না থাকলে এসেছেন কেন ? হাসিনা পরক্ষণে জবাব দিলো, না এলেই পারতেন।

এই হাসিনা। ওর চুলের গোছা ধরে টান দিলো মরিয়ম।

তসলিমের কচি মুখখানা লাল হয়ে গেল।

লিলি হেসে বললো, রাগ করো না হাসিনা—আরেক দিন ভর্তি-ফিল্ম নিয়ে আসবে ও।

মরিয়ম বললো, বড় বেশি ফাজিল হয়ে গেছে।

ফটো তোলার জন্য মাহমুকে ডাকতে গেলে ও বললো, আমার অত শখ নেই।

মরিয়ম বললো, সবাই তুলছি আমরা।

মাহমুদ জবাব দিলো, তোমরা তোলো গে।

মা এসে বললো, কেন কী হয়েছে। ভাইবোন সবাই মিলে ওরা একটা ফটো তুলতে চাইছে, তাতে তোর এত আপত্তি কেন শুনি ? তুই এমন হলি কেন আঁ ?

উত্তরে কী যেন বলতে যাচ্ছিল মাহমুদ। দোরগোড়ায় লিলিকে উঁকি মারতে দেখে থেমে গেলো সে। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে মৃদুগলায় বললো, চলো তোমাদের যখন এত শখ হয়েছে।

কিন্তু কোথায় বসে ফটো তুলবে তা এক সমস্যা দাঁড়িয়ে গেলো। ছাতে বসে তুলবে বলে আগে ভেবেছিলো ওরা। মাহমুদ বললো, পাগলামো আর কী, একসঙ্গে সবাই ওখানে উঠলে, ছাত ভেঙে পড়বে।

হাসিনা বললো, একজন করে উঠলে তো হয়।

কিন্তু গ্রুপফটো তুলতে হলে সকলকে একসঙ্গে বসতে হবে। অবশেষে ঠিক হলো কুয়োর পাশে পাকঘরের সামনে যে অপরিসর আঙিনা আছে সেখানে বসবে ওরা।

ফটো তোলার ব্যাপারে হাসমত আলী কোনো আপত্তি করলেন না। ছেলেমেয়েদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার সাহস তার নেই। শুধু একবার মাথা চুলকে বললেন, আমায় কেন ? বলতে বলতে কুয়োতলায় নেমে এলেন তিনি।

সালেহা বিবি বেঁকে বসলেন। বললেন, তোমরা তোলো, আমি দেখি।
মরিয়ম বললো, এসো না মা।
লিলি বললো, আসুন না খালাম্মা।
হাসিনা রেগে উঠলো, তুই আবার অমন শুরু করলি কেন মা ?
সালেহা বিবি বললেন, আমি বুড়ো মানুষ, আজ বাদে কাল মরবো, ফটো তুললে গুনাহ হয়। মনে মনে তারও ইচ্ছা হচ্ছিলো, কিন্তু ধর্মীয়-সংস্কার বারবার বাধা দিচ্ছিলো এসে।
মাহমুদ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলো এতক্ষণ। বিরক্ত হয়ে এবারে বললো, 'ফটো তোলার যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে, এসো মা। তোমাদের অত ধানাইপানাই আমার ভালো লাগে না, আমি চললাম।' ও চলে যেতে উদ্যত হলো।
ওর রাগ দেখে ফিক করে হেসে দিলো লিলি।
দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে ওর দিকে তাকালো মাহমুদ। একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। মেয়েটা বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারলো না বোধহয়। চোখ নামিয়ে নিল। মা এতক্ষণে রাজি হলেন।
পাকঘরের সিঁড়ির ওপর পাশাপাশি বসলো।
মা–বাবা মাঝখানে। বাবার পাশে মাহমুদ। মায়ের পাশে মরিয়ম। সামনে বসলো হাসিনা, দুলু আর খোকন।
তসলিম বললো, একটু অপেক্ষা করতে হবে। রোদ ঢাকা পড়ে গেছে। মেঘটা সরে যাক।
একফাঁকে খোকনের মনে পড়লো তার ফুটবলটার কথা। দৌড়ে গিয়ে খাটের তলা থেকে ওটা বের করে এনে কোলে নিয়ে বসলো সে। ওর ফুটবল নিয়ে বসতে দেখে, দুলুর মনে পড়লো ওর পুতুলটার কথা। ছুটে গিয়ে পুতুলটা নিয়ে এলো সে, ওর মুখে হাসি। খোকন একবার নিজের ফুটবল আর ওর পুতুলটার দিকে তাকিয়ে ভ্রু বাঁকালো, আর আস্তে আস্তে বললো, আমার দেখাদেখি।
মেঘ সরে গেছে। সকলেই ক্যামেরাটার দিকে তাকালো এবার।
গ্রুপফটো তোলা হয়ে গেলে মাহমুদ চলে যাচ্ছিল। হাসিনা পেছন থেকে হাত টেনে ধরলো ওর। 'ভাইয়া পালাচ্ছো কেন, আমি তুমি আর আপা একখানা তুলবো।
মাহমুদ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, বাজে আবদার করো না।
মরিয়ম ডাকলো—ভাইয়া।
নাও তুলতে হলে তাড়াতাড়ি তোলো। মাহমুদ আবার এসে বসলো পাকঘরের সিঁড়ির ওপর। মরিয়ম আর হাসিনা ওর দু–পাশে।
লিলি মৃদু হাসছিলো আর দেখছিলো ওদের। ওর দিকে চোখ পড়তে মরিয়ম বললো, এসো না লিলি তুমিও এসো।
হাসিনা তাকালো, আসুন লিলি আপা, আসুন না। ওর গলায় আবদারের সুর।
মাহমুদের দিকে তাকিয়ে, মুখখানা রক্তে লাল হয়ে গেলো লিলির। দ্রুত ঘাড় নাড়ালো সে— না, তুলবো না।
মাহমুদ এই প্রথম কথা বললো ওর সঙ্গে—এত লজ্জা নিয়ে আপনি শহরে বেরোন কী করে। ফটো তুলতে আসুন।

লিলি এবার সরাসরি তাকালো ওর দিকে। মুখখানা ম্লান হয়ে গেছে তার। মাথা নেড়ে আস্তে আস্তে বললো, আপনারা তুলুন।

ফটো তোলা শেষ হলে তসলিমকে ধরে বসলো হাসিনা— আমাকে ছবি তোলা শেখাতে হবে।

তসলিম সুবোধ বালকের মতো মাথা নোয়ালো, আচ্ছা।

হাসিনা বললো, আচ্ছা তো বুঝলাম, কিন্তু আপনার দেখা পাওয়া যাবে কোথায় ? তসলিম সঠিক কোনো উত্তর না দিতে পেরে ইতস্তত করছিল।

হাসিনা বললো, আপনি আমাদের বাসায় আসবেন, রোজ একবার করে আসতে হবে কিন্তু।

তসলিম মৃদু হেসে সায় দিলো—আসবো।

হাসিনা সহজে ছেড়ে দিলো না তাকে। ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলো। কী করে ছবি উঠে জিজ্ঞেস করলো। একটা ক্যামেরার দাম কত জানতে চাইলো। আজকে তোলা ফটোগুলো কবে পর্যন্ত পাবে সে ব্যাপারে প্রশ্ন করলো। তসলিম কবে থেকে শিখেছে, এমনি নানান আলাপের শেষে বললো, 'আমাকে কিন্তু শেখাতে হবে নইলে ....' কথাটা শেষ না করলেও অপূর্ব ভঙ্গিতে ওকে শাসালো হাসিনা।

এতদিন ঘরে বন্দি হয়ে থাকলেও আজ লিলির সঙ্গে বাইরে বেরুলো মরিয়ম। দুটি কারণ ছিলো এর পিছনে। প্রথমত মাহমুদকে এ-মুহূর্তে এড়াতে চায় সে। দ্বিতীয়ত নিরালায় বসে মনসুর সম্পর্কে লিলির সঙ্গে আলাপ করবে। একটা সিদ্ধান্ত অবিলম্বে নিতে চায় মরিয়ম।

বাসায় ফিরতে সাঁঝ হয়ে গেলো।

দুপুরে লিলির ওখানে খেয়েছে সে। তারপর গল্প করতে করতে কখন বেলা পড়ে এসেছে সে খেয়াল ছিলো না।

বাইরে থেকে হাসিনার উচ্ছ্বসিত গলার স্বর শুনে বুঝতে পেরেছিলো, মনসুর এসেছে। মাহমুদ ঘরে আছে কি-না উঁকি মেরে দেখে, বারান্দায় বার-কয়েক হোঁচট খেয়ে যখন ভেতরে এলো মরিয়ম, তখন সকালবেলার ফটো তোলার ব্যাপারটা মনসুরকে শোনাচ্ছিলো হাসিনা। তসলিম ফটো তোলা শেখাবে বলেছে। সে খুব ভালো ছেলে, বড় ভালো—এসব কথাও তাকে বলছিলো সে।

মনসুর অন্যমনস্কভাবে শুনছিলো সব। মরিয়মকে দেখে মুখখানা মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে আবার ম্লানতায় ফিরে এলো।

কখন এসেছেন আপনি। ভেতরে এসে প্রশ্ন করলো মরিয়ম।

অনেকক্ষণ। ম্লানমুখে বললো মনসুর—আপনি বুঝি আবার বেরুতে শুরু করেছেন।

মৃদু হেসে ওর পাশ কাটিয়ে এসে বিছানার ওপর বসলো মরিয়ম। ময়লা চাদরটার দিকে চোখ পড়তে হাসিনার প্রতি একটা কটাক্ষ হানলো সে।

হাসিনা আবার ফটো তোলার খবর শোনাতে লাগলো। তারপর বললো, আমাকে একটা ক্যামেরা কিনে দিতে হবে মনসুর ভাই।

মনসুর হেসে দিয়ে বললো, কিনে দেবো।

মরিয়ম উসখুস করছিলো। অকস্মাৎ হাসিনার দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি একটু বাইরে যাও হাসি, মনসুর সাহেবের সঙ্গে আমার কিছু আলাপ আছে। গলার স্বরটা অদ্ভুত শোনালো মরিয়মের।

মনসুর অবাক চোখে তাকালো ওর দিকে।

একবার মরিয়ম, আরেকবার মনসুরের দিকে তাকিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো হাসিনা। একেবারে চলে গেলো না সে। বারান্দায় আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে রইলো।

দুজনে নীরব।

মরিয়ম ভাবছিলো কী করে কথাটা বলা যায় ওকে।

মনসুর শঙ্কিত হলো, চরম মুহূর্তটি বুঝি আজ এলো ওর সামনে।

আরো অনেকক্ষণ চুপ থেকে, অদূরে টেবিলটার দিকে তাকিয়ে মরিয়ম বললো, আপনি রোজ রোজ এখানে কেন আসেন?

যা আশঙ্কা করেছিলো মনসুর।

সারাদেহে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর এলো তার।

ক্ষণকাল পরে সে বললো, সে কথা কি এ মুহূর্তে শুনতে চান আপনি? ওর চোখে চোখ পড়তে দ্রুত চোখজোড়া নামিয়ে নিলো মরিয়ম।

হ্যাঁ। গলাটা কেঁপে উঠলো তার।

আবার নীরবতা।

নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলো মনসুর। বার-কয়েক ঢোক গিলে অবশেষে বললো, আমি আপনাকে ভালোবাসি।

অপ্রত্যাশিত কিছু ছিলো না, তবু সারাদেহ দুলে উঠলো মরিয়মের। জীবনের আরেকটি ক্ষণ, মুহূর্ত মনে পড়ে গেলো। বুকটা দুরদুরু কাঁপছে, ভয়ে-আনন্দে। মুখ তুলে ওর দিকে তাকাতে পারলো না মরিয়ম। মনে হলো, ওর দৃষ্টির সামনে থেকে যদি নিজেকে এখন কোথাও লুকিয়ে ফেলতে পারতো সে। বিছানার চাদরটাকে ডানহাতে আঁকড়ে ধরলো মরিয়ম। ওকে চুপ থাকতে দেখে অদ্ভুত গলায় মনসুর আবার বললো, আমি জানি না আপনি কী ভাবছেন। যদি অন্যায় কিছু বলে থাকি তাহলে ক্ষমা করে দেবেন আমায়, আরেকবার ঢোক গিললো সে। 'কথাগুলো ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না আমি, আপনি বিশ্বাস করুন, জীবনে এই প্রথম একটি মেয়েকে ভালোবেসেছি আমি। যেদিন আপনাকে প্রথম দেখি সেদিন।'

কথার খেই হারিয়ে ফেললো মনসুর।

সমস্ত দেহটা কুঁচকে একটুখানি হয়ে এলো মরিয়মের। ভয় আর আনন্দ। মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলো না সে। খানিকক্ষণ পরে মনসুর আবার বললো, আপনি হয়তো মনে মনে ঘৃণা করতে পারেন আমাকে, কিন্তু যেদিন আপনাকে প্রথম দেখি সেদিনই ঠিক করেছিলাম আমি আপনাকে বিয়ে করবো।

মরিয়ম চমকে তাকালো ওর দিকে।

একজোড়া যন্ত্রণাকাতর চোখ।

পরক্ষণে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো মরিয়ম। কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, 'বাবাকে বলবেন, দয়া করে এসব কথা বাবাকে বলবেন। আমি কিছু জানি না।' বলে তার সামনে থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো মরিয়ম।

আর এলো না।

বিয়ের আনুষঙ্গিক আয়োজনগুলো যত সহজে সারা যাবে বলে মনে করেছিলেন হাসমত আলী, কাজে নেমে দেখলেন সেগুলো তত সহজ নয়। টাকাপয়সার স্বল্পতা পরিকল্পনাগুলোকে বানচাল করে দেয় তবু বড় প্রসন্ন হাসমত আলী।

মেয়ের জন্যে এমন পাত্র কোনোদিন আশা করেননি তিনি। কল্পনায়ও ছিলো না। তবে, যেদিন থেকে মনসুর এ বাড়িতে আসা-যাওয়া শুরু করে সেদিন থেকে সালেহা বিবির সঙ্গে এ বিষয়ে মাঝেমাঝে আলোচনা করেছেন তিনি। আশা-নিরাশায় দুলেছেন দুজনে। স্বপ্ন দেখেছেন।

অবশেষে স্বপ্ন তাদের সফল হতে চলেছে।

ভয় ছিলো একটি, সে হলো মাহমুদ। তাঁরা ভেবেছিলেন মাহমুদ এ বিয়েতে বিরোধিতা করবে। ঝগড়া বাধাবে। অকারণে হৈচৈ করবে। বাধা না দিলেও প্রতিবাদ অবশ্য করেছে মাহমুদ। বলেছে—তোমাদের মেয়ের বিয়ে, কার সঙ্গে বিয়ে দেবে সে তোমরা জানো। তোমাদের মেয়ে জানে। আমাকে শুধুশুধু জিজ্ঞেস করতে এসেছ কেন মা? সালেহা বিবি বলেছেন, সে কি, তোকে জিজ্ঞেস করবো নাতো কাকে জিজ্ঞেস করবো, তুই হলি বড় ছেলে।

মায়ের কথা শুনে হেসেছে মাহমুদ। হাসি থামিয়ে গম্ভীর গলায় বলেছে, দেখো মা, আমার মতামত যদি চাও তাহলে বলবো, এ বিয়েতে মত নেই আমার। অবশ্য আমার মতামতের ওপর ওটা নাকচ করে দাও, সেটা আমি চাইনে।

এ আবার কেমনতরো কথা হলো সালেহা বিবি অবাক হয়ে বললেন, তোর মত থাকবে না কেন, এর চেয়ে ভালো বর আর কোথায় পাবি ওর জন্যে।

মাহমুদ বললো, মা, কেন মিছামিছি আমার মেজাজটা চড়াচ্ছো। ভালো খারাপের কতটুকু তুমি জানো? যে লোকটার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে বলে আহ্লাদে আটখানা হচ্ছো তার চরিত্র বলে কোনো পদার্থ আছে কি খোঁজ নিয়েছো?

দেখ, মুখে যা আসে তা বলে দিস না, একটু ভাবিস। সালেহা বিবি বিরক্তির সাথে বললেন, কে বললো তোকে ওর চরিত্র খারাপ?

মুখ কালো করে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো মাহমুদ। তারপর ধীরেধীরে বললো, মা, তুমি বুঝবে না, মরিয়মকে ডেকে জিজ্ঞেস করো এ দেশে ক'টা লোক আছে যে চরিত্র ঠিক রেখে বড়লোক হতে পেরেছে? অন্যকে ফাঁকি দিয়ে ধোঁকাবাজি আর লাম্পট্য করে, শোষণ আর দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে টাকা রোজগার করে বড়লোক হয়েছে সব। তাদের আবার চরিত্র। ওসব বাজে কথা আমাকে শুনিয়ো না মা। তোমাদের মেয়ে তোমরা বিয়ে দাওগে, আমার কোনো মতামত নেই।

পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরালো মাহমুদ।

উঠে দাঁড়িয়ে চলে যাবার পথে মা আস্তে করে বললেন, তোমার মত থাকুক কি না থাকুক এ বিয়ে হবে।

মা চলে গেলে একটা বই খুলে বসে বারকয়েক বিড়িতে জোর টান দিল মাহমুদ।

ওর মতামতটা মরিয়মের কাছেও অজানা ছিলো না। তাই, পারতপক্ষে মাহমুদের সামনে আসে না সে। যতক্ষণ মাহমুদ ঘরে থাকে ততক্ষণ খুব সাবধানে চলাফেরা করে মরিয়ম। কখনো সামনে পড়ে গেলে, লজ্জায় চোখমুখ লাল হয়ে আসে। পাশ কাটিয়ে একপাশে সরে যায় সে।

আরেকটা ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলো মরিয়ম। আনিসা বেগমকে কী করে মুখ দেখাবে সে। সেলিনাকে মনসুরের কাছে বিয়ে দেবার স্বপ্ন দেখছেন তিনি। কথা প্রসঙ্গে

মনের বাসনাটা জানিয়েও ছিলেন মরিয়মকে। তাকে বড় বিশ্বাস করতেন তিনি। অবশেষে যেদিন মরিয়মের সঙ্গে বিয়ের কথা শুনবেন সেদিন ওর সামনে কী করে দাঁড়াবে মরিয়ম ?

ইদানীং সেলিনাকে পড়াতে যায় সে।

সম্পর্ক আগের মতোই আছে। কিন্তু আর কতদিন এভাবে চলবে সেটা জানে না মরিয়ম। একদিন নিশ্চয় খবরটা যাবে ওদের কানে। যাক, সে নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না সে। তার চেয়ে বিবাহিত জীবনের সুন্দর কল্পনা করতে ওর ভালো লাগে। ভয় আর আনন্দ মেশানো এক অপূর্ব অনুভূতি।

হাসিনা সবচেয়ে খুশি।

বিয়ের পরে ওকে একটা ক্যামেরা কিনে দেবে বলে কথা দিয়েছে মনসুর। তসলিমের কাছে ও ছবি তোলা শিখছে। তার সঙ্গে বসে, আপার বিয়ের সময় ঘরগুলো কীভাবে সাজাবে তা নিয়ে পরিকল্পনা করছে সে। একটা বাঁশের গেট তৈরি করতে হবে বাড়ির সামনে। কিছু পটকাবাজি কিনবে ওরা। আর কয়েক দিস্তা লাল-নীল কাগজ। হ্যাঁ, একটা উপহার ছাপাতে হবে সবার নামে। তোমার নামটাও ওখানে থাকবে তসলিম ভাই, তাই না ? তসলিম মাথা নুইয়ে সায় দেয়—হ্যাঁ।

কিন্তু ঐসবের জন্য টাকার দরকার। বাবার কাছ থেকে কিছু পাওয়া যাবে না জানতো হাসিনা। মাহমুদ শুনলে রাগ করবে তাই চুপিচুপি মনসুরের কাছ থেকে দশটা টাকা আদায় করে নিয়েছে সে। কাউকে বলেনি, বলেছে শুধু তসলিমকে। ওকে দিয়ে কিনাবে সব। আর জানিয়েছে মাকে। মা বললেন, খবরদার মাহমুদের কানে যেন না যায়। বড় বোনের বিয়ে, একটু আমোদ-স্ফূর্তি করবি না তো কী ? হাসিনা বলে, আমায় নতুন একটা শাড়ি কিন্তু কিনে দিতে হবে মা।

মা বলেন, 'বলেছি তো কিনে দেবো।

হাসিনা খুশিতে ঘরময় নেচে বেড়ায়।

মনসুর আজকাল আসা বন্ধ করছে। মরিয়ম নিষেধ করেছে তাকে। ও এলে মরিয়ম বিব্রতবোধ করে। ওর সামনে আসতে লজ্জা লাগে মরিয়মের। আমার কথা ভেবে, এ ক'টা দিন আর এসো না তুমি মনসুরকে বলেছে সে। 'যদি দেখা করতে হয় বাইরে কোরো, কিন্তু সেলিনাদের ওখানে নয়।

একদিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পরে মাহমুদকে ডেকে নিয়ে বসলেন হাসমত আলী। সালেহা বিবিও একখানা পাখা হাতে বসলেন তাদের পাশে। বিয়ের তারিখটা ঘনিয়ে আসছে। কাদের নিমন্ত্রণ করতে হবে। কী খাওয়ানো যেতে পারে। কত টাকার প্রয়োজন তার একটা হিসেব করলেন হাসমত আলী।

মাহমুদ বললো, দলসুদ্ধ লোক নেমন্তন্ন করার কোনো দরকার নেই। যাদের না করলে নয় তাদের দাওয়াত করো।

সালেহা বিবি বললেন, 'কাউকে বাদ দিলে তো চলবে না, বড় মেয়ের, বিয়ে—।

তাই বলে সবাইকে দাওয়াত করতে হবে নাকি। অত লোক খাওয়াবে কী করে ? হাসমত আলী ছেলের পক্ষ নিলেন। টাকার চিন্তা বারবার বিভ্রান্ত করছিলো তাঁকে। কেরানির জীবনে সঞ্চয় সম্ভব নয়। হাসমত আলীও কিছু জমাতে পারেনি। অথচ ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিতে হলে মোটা অঙ্কের না হোক, মোটামুটি একটা অঙ্কের প্রয়োজন।

মাহমুদ বললো, দেখি এ মাসের বেতনটা যদি অগ্রিম পাওয়া যায় তাহলে পুরোটা দিয়ে দেবো আমি।

সালেহা বিবি বললেন, তাহলে তুই চলবি কেমন করে?

সে কথা তোমাকে ভাবতে হবে না মা। মৃদু গলায় জবাব দিলো মাহমুদ। কাদের দাওয়াত করতে হবে তাদের একটা তালিকা তৈরি করলেন হাসমত আলী। কী খাওয়ানো হবে সে সম্পর্কেও আলোচনা হলো। ক্রমে রাত বাড়লে, মাহমুদ ঘুমোতে চলে গেলো।

ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনে শুধু জেগে রইলেন অনেক রাত পর্যন্ত। টাকার কথা ভাবছিলেন ওঁরা।

সালেহা বিবি ফিসফিস করে বললেন, মরিয়মকে দিয়ে মনসুরের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার চাইলে ও নিশ্চয় দেবে।

হাসমত আলীও তাই ভাবছিলেন। এমনি হাত পাতা যাবে না। ধার চাইতে হবে। পরে শোধ করতে পারবেন না তা জানেন তিনি। তবু ধার চাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু মাহমুদ যদি জানতে পারে তাহলে বাড়িসুদ্ধ মাথায় তুলবে।

হাসমত আলী চাপা গলায় বললেন, চাইলে নিশ্চয় দেবে, কিন্তু মাহমুদ কি জানবে না ভাবছো?

সালেহা বিবি বললেন, জানুক। জানলে কী হবে, ও পারবে অতগুলো টাকা জোগাড় করে দিতে?

স্ত্রীর কথায় আশ্বস্ত হতে পারলেন না হাসমত আলী। ইতস্তত করে বললেন, এক কাজ করলে হয় না, অন্য কারো কাছে থেকে কর্জ নিলে।

শোধ করবে কেমন করে? পরক্ষণে সালেহা বিবি জবাব দিলেন— তাছাড়া আরো দুটো মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে সে খেয়াল আছে? হাসিনা আর দুলুর কথা বলছেন সালেহা বিবি।

ওদেরও বিয়ে দিতে হবে একদিন।

বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে আরো অনেকক্ষণ আলাপ করলেন ওরা। টাকা সংগ্রহের বহুবিধ উপায় নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করে অবশেষে দুজনে নীরব হলেন।

রাতে ভালো ঘুম হলো না ওদের।

পরদিন সকালে চা খেতে বসে মাহমুদ বললো, দেখো মা, খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলা না করে, নাস্তাপানি খাইয়ে সকলকে বিদায় দেবার বন্দোবস্ত করো। গরিবের অত ভোজ খাওয়াবার চিন্তা না করাই ভালো।

মা বললেন, গরিব হয়েছি বলে বুঝি সাধ-আহ্লাদ নেই আমাদের?

মাহমুদ মৃদু হাসলো। তারপর হাসি থামিয়ে বললো, মা, রোজ পাঁচ বেলা যার কাছে মাথা ঠোকো, তাকে ভুলেও কি একবার জিজ্ঞেস করতে পারো না, এত সাধ-আহ্লাদ দিয়ে যদি গড়েছেন তোমাদের, সেগুলো পূরণ করার মতো সামর্থ্য কেন দেননি?

এ-কথার তাৎপর্য ঠিক ধরতে পারলেন না সালেহা বিবি। তাই চুপ করে রইলেন তিনি।

ও ঠিক বলছে। ছেলেকে সমর্থন জানালেন হাসমত আলী—অত ভোজ দেবার কী দরকার, আমাদের সামর্থ্য যখন নেই—। কথাটা শেষ করলেন না তিনি।

সালেহা বিবি বললেন, 'সামর্থ্য ক-জনের থাকে। তাই বলে কি তারা বড় মেয়ের বিয়েতে নাস্তাপানি খাইয়ে মেহমান বিদায় করে ? আমার পোড়া কপাল নইলে-।' দু-চোখে পানি এসে জমা হলো তাঁর। আঁচলে চোখ মুছলেন তিনি।

মায়ের কান্না দেখে আর কোনো কথা বলতে সাহস পেলো না মাহমুদ। চা-টা শেষ করে নীরবে উঠে গেলো সে। হাসমত আলী বার-কয়েক মাথা চুলকোলেন তারপর দু-হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে চুপচাপ কী যেন ভাবতে লাগলেন তিনি।

আজ মরিয়মের বিয়ে।

সকাল থেকে পুরা বাড়িটায় উৎসব। মেহমান, অতিথি—গিজগিজ করছে ঘরগুলো, বারান্দা, কুয়োতলা।

ভোরে ভোরে পাকঘরে ঢুকেছেন সালেহা বিবি। সেখান থেকে আর বেরোননি। পাড়ার কয়েকজন বয়স্কা মহিলা— যাদের ওরা নেমন্তন্ন করেছিলো— কাজের সহায়তা করছে তাঁকে।

হাসিনা, খোকন আর তসলিম, আগের রাতে সাদা সুতোয় লাল-নীল কাগজ এঁটে ঘরগুলো সাজিয়েছে। সামনে একটা বাঁশের তোরণ তৈরি করছে তারা। মাহমুদের ঘরটায় বরযাত্রীদের এনে বসানো হবে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে, ওর বইপত্র আর কাগজগুলো মায়ের খাটের নিচে একটা চাটাই বিছিয়ে তার ওপর রেখে এসেছে মাহমুদ। কুয়ো থেকে পানি তুলে এনে নিজহাতে ঘরটা ধুয়েমুছে দিয়েছে সে। লিলি এসেছে। সেলিনাও এসেছে আজ। ওকে নিজে গিয়ে আমন্ত্রণ জানাতে সাহস পায়নি মরিয়ম। চিঠি লিখে জানিয়েছে। আনিসা বেগমের মুখোমুখি হতে ভয় ওর। সেলিনাকে দেখে বেশ খুশি হয়েছে বলে মনে হলো। মনসুর ভাই-এর সঙ্গে মরিয়ম আপার বিয়ে—আনন্দ যেন উপচে পড়ছে ওর চোখেমুখে। মা আসতে নিষেধ করেছিলেন। তবু চুপিচুপি চলে এসেছে সেলিনা। ওরা সব মরিয়মের ঘরে, ঘিরে বসেছে ওকে। গল্প করছে, হাসছে, কৌতুকে ফেটে পড়ছে মাঝেমাঝে।

হাসমত আলী পাকঘরে গিয়ে একবার সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে এলেন, দুপুরের মধ্যে সবকিছু তৈরি হয়ে যাওয়া চাই। অপরাহ্ণে বর আসবে।

মাহমুদ সব আয়োজন শেষ করে ফরাশের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে বিড়ি ধরালো একটা। অন্য ঘরে আত্মীয়-স্বজনেরা এসে ভিড় জমালেও এখানে সকলকে আসতে নিষেধ করেছে। চিৎকারে মাথা ধরে ওর।

লিলি উঁকি মেরে চলে যাচ্ছিল।

মাহমুদ ডাকলো, শুনুন।

লিলি ফিরে এসে বললো, আমায় ডেকেছেন ? সারা গায়ে ঘাম ঝরছে তার। শাড়ির আঁচল দিয়ে বারবার মুখ মুছছে।

মাহমুদ বললো, ওখানে হৈ হট্টগোলের মধ্যে যদি আপনাদের ভালো না লাগে, এখানে এসে বসতে পারেন। আমি বাইরে বেরুচ্ছি। লিলি মৃদু হেসে বললো, ধন্যবাদ।

মরিয়ম আর সেলিনাকে নিয়ে এ ঘরে দরজায় খিল এঁটে দিলো লিলি। বাব্বাঃ গরমে সেদ্ধ হয়ে যাবার অবস্থা। ফরাশের ওপর শুয়ে শাড়ির আঁচলে গায়ে বাতাস দিতে লাগলো ওরা।

হাসিনা কড়া নাড়ছিলো।

প্রথমে কেউ সাড়া দিলো না। পরে সে যখন দরজার ওপর দুমদাম শব্দে কিল–চাপড় দিতে লাগলো তখন উঠে দরজাটা খুলে দিলো সেলিনা।

ভেতরে এসে হাসিনা বললো, এখানে শুয়ে শুয়ে কী করছো তোমরা, আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান। দরজায় খিল এঁটে ওদের পাশে শুয়ে পড়লো সে।

লিলি বললো, বিয়ের পর আমাদের ভুলে যাবে না তো ম্যারি।

মরিয়ম হাসলো। কিছু বললো না।

সেলিনা ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞেস করলো, বিয়ের পর আমাকে আর পড়াতে যাবে না তুমি, তাই না আপা?

মরিয়ম ওর চুলে সিঁথি কেটে বললো, যেতাম, কিন্তু তোমার মা যে আর ও বাড়িতে ঢুকতে দেবে না আমায় সেলিনা।

আপার মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল সেলিনা। তারপর বললো, আচ্ছা আপা, মা তোমার বিয়ের খবর শুনে অমন রেগে গেছেন কেন? বারবার শুধু গালাগাল দিচ্ছেন তোমাকে। আমাকেও।

হাসিনা পরক্ষণে বললো, আপনার মায়ের ভীমরতি হয়েছে।

মায়ের সম্পর্কে কটু মন্তব্য শুনে মুখখানা কালো হয়ে গেলো সেলিনার।

মরিয়ম ধমকের সুরে বললো, বাজে বকো না হাসিনা, এখান থেকে যাও।

হাসিনা পাশ ফিরে।

বাইরে বিয়েবাড়ির হাঁকডাক, হৈ–হুল্লোড় আর ধুপধাপ শব্দ এখান থেকেই শোনা যাচ্ছে। পাড়ার প্রবীণেরা বাইরে দাওয়ায় বসে সুখ্যাতি গাইছে বরের। হাসমত আলীর কপাল, নইলে অমন বড়লোক বর ক'জনের ভাগ্যে জোটে?

লিলি মুখখানা মরিয়মের মুখের কাছে বাড়িয়ে এনে, ওর চিবুকটা নেড়ে দিয়ে ফিসফিস-করে বললো, কার কথা ভাবছিস ম্যারি, বরের কথা বুঝি?

ধ্যাৎ। লজ্জায় লাল হয়ে গেলো মরিয়ম। কপট অভিমানে মুখখানা অন্যদিকে সরিয়ে নিলো সে।

দুপুরে, যথাসময়ে বরযাত্রীরা এলো।

গলির মাথায় একসার মোটর থামিয়ে, নোংরা আবর্জনা পেরিয়ে আসতে বেশ কষ্ট হলো ওদের।

ঘরে পাখা নেই, গরমে হাঁসফাঁস করলো তারা। কলকল শব্দে কথা বললো।

খেলো।

পান চিবোল।

বিয়েটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেলো মরিয়মের।

কন্যা সম্প্রদানের সময় হু হু করে কেঁদে দিলেন হাসমত আলী। সুখী হও মা, সুখে থেকো।

সালেহা বিবি আঁচলে চোখ মুছলেন, কুয়োতলায় বসে ডুকরে কাঁদলেন। পাড়ার বয়স্কা মেয়েরা সান্ত্বনা দিলেন তাঁকে।

এ সময়ে কাঁদতে নেই বউ। সব মেয়ে কি চিরকাল বাপের বাড়ি থাকে?

হাসিনার চোখেও অশ্রু। কান্না লুকোতে গিয়ে দরজার আড়ালে মুখ লুকোল সে।

মাহমুদ নির্বাক। ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে সে শুধু নীরবে চেয়ে-চেয়ে দেখছিলো কেমন করে একটি মেয়ের জীবন এক ছেলের জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে গেলো এক মুহূর্তে।

রাতের প্রথম প্রহরে কনে নিয়ে চলে গেল ওরা।

সঙ্গে খোকন গেলো। তসলিম গেলো। কয়েকজন নিকট ও দূর-আত্মীয়ও গেলো কন্যাপক্ষ হয়ে।

মাহমুদকে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলো সকলে, ও গেলো না। ফরাশের ওপর চুপচাপ শুয়ে রইলো সে।

মেহমান অতিথি যারা এসেছিলো তারা বিদায় নিয়ে গেছে অনেক আগে। সেলিনা চলে গেছে। পাড়ার বউঝিয়েরাও। লিলিকে যেতে দেয়নি হাসিনা। বলেছে— আজ রাতে তুমি থাকো লিলি আপা, নইলে একা ভীষণ ভয় করে আমার।

লিলি বলেছে, 'পাগল, বাসায় না গেলে বকবে সবাই।

সালেহা বিবি বলেছেন, যাবে আর কি, আরো কিছুক্ষণ থেকে যাও মা, রাতে খেয়ে যেয়ো।

লিলি গেলো না।

পাকঘরে সবকিছু গোছাবার কাজে মাকে সহায়তা করলো হাসিনা আর লিলি।

একটু আগে যে-বাড়িটা গমগম করছিলো মানুষের কোলাহলে, এখন সেখানে কবরের নিস্তব্ধতা। মাঝেমাঝে থালাবাসনগুলো নাড়াচাড়া আর কুয়োতলায় পানি তোলার শব্দ হচ্ছে।

তন্দ্রায় দু-চোখ জড়িয়ে এসেছিলো মাহমুদের।

হাসিনার ডাকে তন্দ্রা ছুটে গেলো।

হাসিনা বললো, ভাইয়া খাবে এসো।

মাহমুদ বললো, তুই যা, আমি আসছি। পরক্ষণে কী মনে হতে আবার বললো, হ্যারে, সবাই কি চলে গেছে?

হাসিনা বললো, হ্যাঁ, শুধু লিলি আপা আছে।

মায়ের ঘরে এসে মাহমুদ দেখলো, বাবা কাত হয়ে শুয়ে আছেন খাটের ওপর। দুলু ঘুমাচ্ছে। হাসিনা আর লিলি কুয়োর পাড়ে, বসে গল্প করছে।

খাওয়া শেষ হলে লিলি বললো, এবার যাই আমি হাসি।

সালেহা বিবি বললেন, এই রাতে যাবে তুমি?

লিলি বললো, পারবো খালাম্মা।

মাহমুদকে পেয়ে সালেহা বিবি বললেন, তুই কি বাইরে বেরুবি আজ?

মাহমুদ বললো, হ্যাঁ, এখুনি বেরুবো। সারাদিন তো তোমাদের বিয়ের ঝামেলায় কাটলো। এখন সারারাত জেগে প্রুফ দেখতে হবে আমায়। কিন্তু, কেন বলোতো?

সালেহা বিবি ইতস্তত করে বললেন, লিলি মেয়েটা একা যাচ্ছে, ওকে একটু এগিয়ে দিয়ে—। কথাটি শেষ করলেন না তিনি।

মাহমুদ ওর দিকে একপলক তাকিয়ে বললো, দিতে পারি, ওর যদি কোনো আপত্তি না থাকে।

লিলি ঢোক গিললো, কিছু বললো না।

রাতের এই প্রহরে পথঘাটগুলো বড় নির্জন হয়ে আসে। টিমটিমে বাতি-জ্বলা দোকানিরা শেষ খদ্দেরের প্রত্যাশায় তখনো বসে। আশেপাশে কোনো রিকশা নেই।

লিলি বললো, আপনার যদি কোনো অসুবিধে না হয় যেতে পারেন, আমার কোনো আপত্তি নেই।

তারপর নীরবে দুজনে হেঁটে চললো ওরা। কখনো আগে কখনো পিছে। কখনো পাশাপাশি। মাহমুদ কী যেন ভাবছিলো। হঠাৎ সে বললো, কী অদ্ভুত। তাই না ? লিলি চমকে তাকালো ওর দিকে— কী ?

মাহমুদ বললো, এ বিয়েটা।

লিলির কিছু বোধগম্য হলো না। অবাক হয়ে শুধালো— বিয়েটা মানে ?

হ্যাঁ এই বিয়েটার কথা বলছিলাম। মাহমুদ ধীরে ধীরে বললো, কতগুলো লোক এলো, খেলো আর হাত তুলে মোনাজাত করলো, ব্যস্, একটা মেয়ের জীবন আরেকটা ছেলের জীবনের সঙ্গে চিরকালের জন্যে গেঁথে গেলো। এই ফার্সটা না করলেও তো চলে।

লিলি ফিক করে হেসে দিয়ে বললো, বিয়েটা বুঝি ফার্স বলে মনে হয় আপনার কাছে ?

মাহমুদ মুখ ঘুরিয়ে তাকালো ওর দিকে। একটা তীক্ষ্ণ তীব্র দৃষ্টি। সে দৃষ্টি সবকিছু অস্বীকার করতে চায়। সারাপথ আর একটি কথাও বললো না মাহমুদ। লিলিকে তার বাসা পর্যন্ত এগিয়ে যখন প্রেসে এসে পৌঁছলো মাহমুদ, তখন রাত সোয়া এগারোটা। টেবিলের ওপর স্তূপাকারে প্রুফশিটগুলো রাখা আছে। ওগুলো দেখে শেষ করতে রাত দুটো-তিনটে বেজে যাবে। তারপর বাসায় ফিরবে না মাহমুদ। লম্বা টেবিলটার ওপর গুটিসুটি হয়ে শুয়ে রাত কাটিয়ে দেবে।

একটা বিড়ি ধরিয়ে চেয়ারটা টেনে বসে পড়লো মাহমুদ। পরদিন ভোরে, বিশ্রামাগারে যখন এলো সে, তখন চোখজোড়া ভয়ানকভাবে জ্বালা করছে।

রেস্তোরাঁয় আর কোনো খদ্দের আসেনি এখনো। খোদাবক্স টেবিল-চেয়ারগুলো সাজাচ্ছে আর চাকর ছোঁড়াটা আগুন দিচ্ছে চুলোয়। ওকে আসতে দেখে খোদাবক্স বললো, ইয়ে হয়েছে মাহমুদ সাহেব, আপনাকে যেন বড় কাহিল কাহিল মনে হচ্ছে আজ ?

মাহমুদ একখানা চেয়ারের ওপর ধপ করে বসে পড়লো, ইয়ে হয়েছে এককাপ কড়া চা বানিয়ে দাও জলদি করে। থাকলে চায়ের সঙ্গে একটা টোস্ট দিও।

ছেলেটা একটা পাখা এনে জোরে বাতাস করতে লাগলো চুলোয়। কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে উপরে, ধীরেধীরে আগুনের শিখাগুলো উঁকি মারলো। কালো চায়ের কেতলিটা চুলোর ওপর তুলে দিলো সে। টেবিল-চেয়ারগুলো ঠিকভাবে সাজানো হয়েছে কিনা দেখে খোদাবক্স বললো, আজ বুঝি নাইট ডিউটি ছিলো ? খোদাবক্স জানতো না যে, মাহমুদ ও-চাকরিটা অনেক আগে ছেড়ে দিয়েছে। মাহমুদ টেবিলের ওপর মাথা রেখে বললো, তোমার মাথা, ও চাকরি আমি কবে ছেড়ে দিয়েছি।

খোদাবক্স অবাক হয়ে বললো, কই কিছু বলেননি তো আপনি ?

তোমাকে সবকিছু বলতে হবে নাকি ?

ধমক খেয়ে চুপ করে গেলো খোদাবক্স, তাড়াতাড়ি চা বানিয়ে দেবার জন্যে ছেলেটাকে তাড়া দিলো। তারপর দুঠোঁটে হাসি টেনে আবার বললো, 'আপনার বন্ধু নঈমের একটা চাকরি হয়েছে, শুনেছেন কি মাহমুদ সাহেব ?

শুনিনি, এই শুনলাম। দু-বাহুর আড়ালে মুখ লুকালো মাহমুদ।

ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন খদ্দের এসেছিলো। তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করলো খোদাবক্স। খাতাপত্র দেখে কী যেন হিসেব করলো। ড্রয়ার খুলে খুচরা পয়সাগুলো নেড়েচেড়ে দেখলো। তারপর আবার বললো, ইয়ে হয়েছে মাহমুদ সাহেব, শুনলাম আপনার বোনের বিয়ে হয়েছে কাল ?

এক চুমুক চা খেয়ে মাহমুদ বললো, তুমি জানলে কোথা থেকে ?

খোদাবক্স ইতস্তত করে জবাব দিলো, না, কাল আপনি আসেননি কিনা, ওরা সবাই আলোচনা করেছিলো।

হুঁ—কাপটা পিরিচের ওপর থেকে আবার তুলে নিলো মাহমুদ।

খোদাবক্স মুখে হাসি ফুটিয়ে বললো, ইয়ে হয়েছে মাহমুদ সাহেব, শুনলাম ছেলের নাকি গাড়ি আছে ?

হ্যাঁ।

তাহলে তো আপনার আর কোনো চিন্তা নেই মাহমুদ সাহেব, এবার একটা ভালো চাকরি নিশ্চয় পাবেন।' গদগদ গলায় বললো খোদাবক্স।

একটা টোস্ট আর এককাপ চা, লিখে রাখুন। মাহমুদ উঠে দাঁড়ালো। বেরুতে যাবে এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো রফিক। এই মাহমুদ, তোমার কথা ভাবতে ভাবতেই আসছিলাম। তুমি কি চলে যাচ্ছো নাকি ? একটু বসো প্লিজ, বসো একটু। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে আমার।

মাহমুদ বললো, পরে বলো, এখন ভালো লাগছে না আমার, বাসায় যাবো।

একটু বসে যাও, এই একটু। ওর গলায় করুণ আকুতি। প্রেমে পড়ার পর থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছে সে। মাহমুদ বসলো। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো রফিক। তারপর হাসি থামিয়ে বললো, এবার তুমি নিশ্চয় হতাশ করবে না আমায় মাহমুদ।

মাহমুদ বললো, খোলাসা করে বলো, কিছু বুঝতে পারলাম না।

তোমার বোনের বিয়ের খবর আমরা পেয়েছি মাহমুদ। যদিও তুমি কিছুই জানাওনি।

মাহমুদ জবাব দিলো, আমার বোনের বিয়েতে তোমাদের কিছু জানাবার ছিলো বলে তো মনে হয় না।

না না আমি সে কথা বলছি না। লজ্জা পেয়ে রফিক পরক্ষণে বললো, তুমি অল্পেতেই সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ো। আমি বলছিলাম কী, তোমার ভগিনীপতির হাতে অনেক চাকরি আছে শুনেছি। তুমি যদি আমার হয়ে তাকে একটু বলো কিম্বা তাকে চিঠি লিখে দাও।

ও এই ব্যাপার। মুখখানা কালো হয়ে গেলো মাহমুদের।

আমার জন্যে অন্তত এইটুকু করো মাহমুদ। নইলে মেয়েটার ওরা বিয়ে দিয়ে ফেলবে অন্য কোথাও। মনে হচ্ছিলো সে এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে। ডুকরে গড়িয়ে পড়বে ওর পায়ের ওপর।

মাহমুদ নির্বাক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। তারপর মৃদু গলায় বললো, তার চেয়ে একখানা ছুরি নিয়ে আমার গলাটা কেন কেটে দাও না বন্ধু ?

তোমার কি আমার জন্যে এতটুকু অনুভূতি নেই মাহমুদ ?

নেই।

মেয়েটির কথাও কি তুমি একটু ভাবছো না ?

না।

তুমি কি পাথর দিয়ে তৈরী ? এবার সত্যি কেঁদে ফেলবে রফিক।

হ্যাঁ, আমি পাথর দিয়ে তৈরী। ছুটে সেখান থেকে বেরিয়ে এলো মাহমুদ। ওর জল ছলছল চোখজোড়া আর সহ্য হচ্ছিল না মাহমুদের।

বাসায় এসে লম্বা একটা ঘুম দিল মাহমুদ। ঘুম যখন ভাঙলো তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। কুয়োতলায় বসে অনেকক্ষণ ধরে গায়ে পানি ঢেলে স্নান করলো সে। বাসায় এখন মা আর দুলু ছাড়া কেউ নেই। বাবা অফিসে, হাসিনা স্কুলে, খোকন মরিয়মের সঙ্গে গেছে। স্নান সেরে আসতে সালেহা বিবিও এলেন পিছুপিছু। মাহমুদ বুঝলো, মা কিছু বলতে চান। চুলে চিরুনি বুলিয়ে নিয়ে সে তাকালো মায়ের দিকে—কিছু বলবে কি মা ?

মা বললেন, মরিয়মটা নেই, বাড়িটা কেমন ফাঁকা লাগছে।

মাহমুদ কোনো মন্তব্য করলো না দেখে ক্ষণকাল পর আবার বললেন তিনি— তুই একটা বিয়ে কর মাহমুদ। এ কথাটা বলতে বোধহয় এসেছিলেন সালেহা বিবি।

মৃদু হাসলো মাহমুদ।

হাসছিস কেন ? মা অবাক হয়ে বললেন, বয়স কি কম হয়েছে তোর ?

মাহমুদ হাসি থামিয়ে বললো, বিয়ে করে আরেকটা ঝামেলা বাড়িয়ে কী লাভ মা ?

ঝামেলা হতে যাবে কেন ? মা জবাব দিলেন বউ আনলে লক্ষ্মী আসবে ঘরে।

মাহমুদ ভ্রু বাঁকিয়ে বললো, খাওয়াবে কী ?

সালেহা বিবি বললেন, কেন আমরা কি উপোস থাকি ?

অনেক জোড়াতালি-দেয়া মায়ের পরনের শাড়িটার দিকে চোখ নামিয়ে এনে আস্তে করে বলল, 'যেভাবে আমরা থাকি সেভাবে মানুষ থাকে না মা। কী দরকার আরেকটা নিরীহ মেয়েকে অমানুষ বানিয়ে ?'

নিজের শতচ্ছিন্ন শাড়িটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলেন সালেহা বিবি।

আমেনার শাড়িটাও অজস্র ছেঁড়া আর তালিতে ভরা। সেও মা। তারও ছেলেমেয়ে আছে। স্বামী আছে।

তবু, সালেহা বিবির সঙ্গে কোথায় যেন একটা বিরাট ব্যতিক্রম রয়েছে ওর। চৌকির এককোণে বসে নীরবে আমেনাকে দেখছিলো আর ভাবছিলো মাহমুদ।

ঘরটা ঝাঁটা দিয়ে টুকিটাকি জিনিসপত্রগুলো গোছাচ্ছিলো আমেনা। মুখ তুলে বললো, প্রেস বিক্রি করে দেবে দাও, বারবার আমাকে জিজ্ঞেস করো কেন। আমি, কোরো না বললেই কি আর রেহাই পাওয়া যাবে।

কথাগুলো শাহাদাতকে উদ্দেশ্য করে।

মাহমুদের মুখোমুখি একখানা টুলের ওপর বসে ছিলো সে। নড়েচড়ে একবার মাহমুদ আরেকবার আমেনার দিকে তাকিয়ে সে বললো, তাই বলে তোমার বুঝি কোনো মতামত থাকবে না?

আমেনার মতামত ছাড়া শাহাদাত কিছু করে না তা নয়। এক্ষেত্রে আমেনার মতামত চাওয়ার মধ্যে একটু সুপ্ত ইচ্ছা লুকিয়ে রয়েছে, সেটা জানতো মাহমুদ। আমেনার বড় তিনভাই রোজগার করছে ইদানীং। ধানমণ্ডীতে বাড়ি করেছে ওদের। গাড়ি কিনেছে একখানা। ছেলেমেয়ে নিয়ে ওরা বেশ সুখে আছে। আমেনা ইচ্ছা করলে এ দুঃসময়ে হাত পাততে পারে ওদের কাছে। রক্তের ভাই, সহজে না করবে না। প্রেসটাকেও তাহলে বিক্রির হাত থেকে বাঁচানো যাবে। কিন্তু প্রস্তাবটা সরাসরি মুখ ফুটে বলতে ভয় পায় শাহাদাত। আমেনার স্বভাবটা ওর অজানা নয়। আমেনা কিছুক্ষণ পর বললো, আমার মতামত আবার নতুন করে কী দেবো। চালাতে না পারলে বিক্রি করে দাও।

শাহাদাত বললো, তারপর চলবে কেমন করে ?

আমেনা গম্ভীর হয়ে বললো, আর পাঁচজন যেমন করে চলে— বলে বাচ্চা ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেলো আমেনা। এতক্ষণ মাহমুদ একটি কথাও বলেনি। সে ভাবছিলো, মায়ের সঙ্গে আমেনার ব্যতিক্রম যেখানে— সেখানে ওর সঙ্গে রয়েছে একটা আশ্চর্য মিল। না তা নয়। আমেনাকে ওর নিজের চেয়েও বড় মনে হলো আজ।

শাহাদাত মৃদু গলায় বললো, দেখলে তো কী যে স্বভাব পেয়েছে ও, বুঝি না। দূরের কেউ তো নয়, আপন মায়ের পেটের ভাই। দরকার পড়েছে তাই হাত পাতবে। ভিক্ষে তো চাইছি না, ধার চাইছি। এতে অসম্মানের কী হলো ? মাহমুদ চুপ করে রইলো।

ওকে নীরব থাকতে দেখে শাহাদত আবার বললো, আরে ভাই, ওদের হচ্ছে হারামীর টাকা। কন্ট্রাক্টারি করে, রাস্তায় রাস্তায় রোজগার করছে। দিতে একটুও গায়ে লাগবে না।

মাহমুদ আস্তে করে বললো, ওই হারামী টাকাগুলো এনে তোমার অনেক শ্রমে গড়া প্রেসটাকে কলুষিত করো না শাহাদাত। তার চেয়ে বিক্রি করে দাও ওটা।

ওর কাছ থেকে কোনোরকম সমর্থন না-পেয়ে হতাশ হয়ে পড়লো শাহাদাত। সবার ইচ্ছে প্রেসটা ও বিক্রি করে দেয়। কিন্তু বিক্রির কথা ভাবতে গিয়ে নিজের মন থেকে সত্যিকার কোনো সাড়া পায় না সে। বুকটা ব্যথায় চিনচিন করে ওঠে। কত কষ্টে গড়া ওই প্রেস। বারকয়েক উসখুস করে ধীরগলায় হঠাৎ শাহাদাত বললো, তোমরা কি আমার কথা একবারও ভাবো না ? ঐ প্রেসটার পেছনে সর্বস্ব দিয়েছি আমি, ওটাকে অন্যের হাতে তুলে দিয়ে কী করে বাঁচবো, বলো ?

মাহমুদ নীরব।

পরপর কয়েকটা লম্বা লম্বা শ্বাস নিলো শাহাদাত। তারপর অনেকটা অভিমানভরা কণ্ঠে বললো, ঠিক আছে, তাই হবে। বলে চুপ করে গেলো সে।

এ-সময়ে আবার এ-ঘরে এলো আমেনা। মরিয়মের বিয়ে প্রসঙ্গে দু-চারটে প্রশ্ন করলো সে। কোথায় বিয়ে হয়েছে, ছেলে দেখতে-শুনতে কেমন, কী করে। পানদানটা সামনে রেখে একটা পান বানিয়ে খেলো আমেনা। তারপর আবার চলে গেলো। অনেকক্ষণ পর মাহমুদ বললো, প্রেসটা বিক্রি করে দেবার পর কী করবে ? চাকরি-বাকরি—!

কথা শেষ করতে পারলো না। শাহাদাত বাধা দিয়ে বললো, কী যে বলো তুমি ? আমি চাকরি করবো ? আমেনা তাহলে গলায় দড়ি দেবে। বলে হেসে উঠলো সে। হাসতে গিয়ে চিবুকে অনেকগুলো ভাঁজ পড়লো তার।

মাহমুদ কিছু বলবে ভাবছিলো।

আমেনা আবার এলো সেখানে— কী হলো অমন হাসছো যে। বলতে গিয়ে খুকখুক করে বারকয়েক কাশলো সে। আবার কাশলো।

শাহাদাত বললো, কিছু না, তুমি ভীষণ ঠাণ্ডা লাগাও আজকাল। এ কথার কোনো জবাব দিলো না আমেনা। খানিকক্ষণ কেশে নিয়ে ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসলো সে।

ওদের এই দাম্পত্য আলাপের মাঝখানে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলো মাহমুদ। কাল বিকেলে এতক্ষণ বর এসে গেছে মরিয়মের। আজ সে শ্বশুরবাড়ি। সঙ্গে খোকনও আছে। হাসিনা ফিরেছে স্কুল থেকে।

বাসায় এখন বাবা, মা, দুলু আর সে হয়তো বসে বসে বিয়ের গল্প করছে। কাল স্বামীসহ আবার বাড়ি ফিরে আসবে মরিয়ম। হাসিনার ঘরে ওদের থাকার বন্দোবস্ত করা হবে। হাসিনা থাকবে মায়ের সঙ্গে। আর বাবার জন্যে মাহমুদের ঘরে একটা নতুন বিছানা পাতা হবে। মা হয়তো এতক্ষণ সে বিষয় নিয়ে আলাপ করছেন বাসায় সবার সঙ্গে। মাহমুদ উঠে দাঁড়ালো।

শাহাদাত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, ও কি উঠলে কেন?

মাহমুদ আস্তে করে বললো, না, এবার যাই।

যাবে আর কি বসো না।

না আর বসবো না।

কোথায় যাবে? টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে লম্বা একটা হাই তুললো শাহাদাত।

মাহমুদ বললো, প্রেসে, দেখি কোনো কাজ আছে কিনা। শরীরটা আজ বড্ড ম্যাজম্যাজ করছে, তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে যাবো।

আমেনা পেছন থেকে শুধালো, মরিয়ম ফিরছে কখন?

মাহমুদ সংক্ষেপে বললো, কাল।

আমেনা বললো, আবার একদিন এসো তুমি, খাওয়ার দাওয়াত রইলো।

মাহমুদ আস্তে করে বললো, আসবো। তারপর শাহাদাতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় নেমে এলো সে।

দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডারটার দিকে তাকিয়ে অবাক হলো মরিয়ম। বিয়ের পর তিনটে মাস কেটে গেছে। দিনগুলো যে বাদামতোলা নৌকার মতো দেখতে-না-দেখতে চলে গেলো। প্রথম প্রথম মনসুর তো ব্যবসাবাণিজ্য প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলো। সারাদিন ঘরে থাকতো। সারাক্ষণ মরিয়মের পাশে। মরিয়ম রাগ করে বলতো, ব্যবসাটা কি ডোবাবে নাকি?

মনসুর বলতো, তোমার জন্যে ডোবে যদি তাহলে ডুবুক। ক্ষতি নেই। রোজ বিকেলে সাজ-পোশাক পরে চকোলেট রঙের গাড়িতে বেড়াতে বেরিয়েছে ওরা। যেখানে যেতে চেয়েছে মরিয়ম সেখানে নিয়ে গেছে মনসুর।

মাঝে বারকয়েক বাবার বাড়িতেও এসেছিলো মরিয়ম। দিন দু-তিনেক করে থেকে গেছে।

আরো থাকতো। মনসুরের পীড়াপীড়িতে থাকতে পারেনি।

নিজের সচ্ছল জীবনের পাশে বাবা-মা ভাইবোনদের দীনতা মনে আঘাত দিয়েছে মরিয়মের। যখন যা পেরেছে টাকাপয়সা দিয়ে ওদের সাহায্য করেছে সে। মনসুর কথা

দিয়েছে একটা ভালো বাড়ি দেখে সেখানে নিয়ে আসবে ওদের। ভাড়াটা ও নিজেই দেবে, আর হাসিনা ও খোকনের পড়ার খরচটা চালাবে মনসুর। শুনে প্রসন্ন হয়েছে মরিয়ম। মা-বাবারও খুশির অন্ত নেই। যখন হাত পেতেছেন, কিছু-না-কিছু পেয়েছেন মনসুরের কাছে। জীবনটা বেশ চলছিলো।

কিন্তু দু-মাস না যেতে, অকস্মাৎ একদিন প্রথম জোয়ারের উচ্ছ্বাসে ভাটা এলো। খাওয়ার টেবিলে সেদিন বড় উন্মনা মনে হচ্ছিলো মনসুরকে। শোবার ঘরে এসে প্রথম বললো, তোমাকে একটা কথা আজ জিজ্ঞেস করবো ম্যারি, উত্তর দেবে?

শঙ্কিত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে মরিয়ম জবাব দিলো, কী কথা বলো।

জাহেদ নামে কোনো ছেলেকে তুমি চিনতে? ওর দৃষ্টি মরিয়মের চোখের ওপর।

বুকটা বহুদিন পর কেঁপে উঠেছে মরিয়মের। ইতস্তত করে বললো, চিনতাম।

মনসুরের মুখখানা কালো হয়ে এলো। ক্ষণকাল পর সে আবার বললো, তার সঙ্গে কী সম্পর্ক ছিলো তোমার?

মুখখানা মাটির দিকে নামিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো মরিয়ম। তারপর মুখ তুলে সরাসরি ওর দিকে তাকিয়ে বললো সে, ওকে আমি ভালবাসতাম— বলতে গিয়ে একটা ঢোক গিললো মরিয়ম।

ভালোবাসতে। যেন আর্তনাদ করে উঠল মনসুর।

মরিয়ম আস্তে করে বললো, হ্যাঁ।

মাথার ওপরের পাখাটা আরো জোরে ঘুরিয়ে দিয়ে মনসুর কাঁপা-গলায় বললো, তারপর?

মরিয়মের দেহটা পাথরের মতো নিশ্চল ঠাণ্ডা। অকম্পিত গলায় সে জবাব দিলো— তখন আমি স্কুলে পড়ি। বাবা হঠাৎ পড়া বন্ধ করে দিয়ে বিয়ে ঠিক করে ফেললেন আমার। জাহেদকে আমি ভালোবাসতাম। আমাদের পাড়াতেই থাকতো। কলেজে পড়তো। সেও ভালোবাসতো আমায়। মরিয়ম থামলো, থেমে বারকয়েক ঘনঘন শ্বাস নিলো সে। তারপর আবার বললো, বাবা যখন কিছুতেই বিয়ের আয়োজন বন্ধ করলেন না তখন একদিন রাতে ওর সঙ্গে পালিয়ে গেলাম আমি।

পালিয়ে গেলে! দ্বিতীয়বার আর্তনাদ করে উঠলো মনসুর।

মরিয়ম অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে— ঢাকা থেকে পালিয়ে চিটাগাং চলে গেলাম আমরা। জাহেদ তার মায়ের কিছু অলংকার আর নগদ টাকা সঙ্গে নিয়েছিলো। কথা হয়েছিলো চাটগাঁ গিয়ে একটা বাসা ভাড়া নেবো আমরা। জাহেদ একটা চাকরি জোগাড় করবে। মরিয়ম থামলো।

টেবিলের ওপর সাজিয়ে-রাখা জগ থেকে একগ্লাস পানি খেয়ে এসে আবার বললো মনসুর—তারপর?

পাখার বাতাসে কালো চুলগুলো বারবার উড়ে উড়ে পড়ছিলো মরিয়মের ফরসা মুখের ওপর। আস্তে করে সে আবার বললো, ওখানে গিয়ে বাসা পাওয়া গেল না, একটা সস্তা হোটেলে একখানা রুম ভাড়া করেছিলাম আমরা।

একসঙ্গে ছিলে? ওর মুখের দিকে তাকাতে সাহস হলো না মনসুরের।

মরিয়ম হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে জবাব দিলো, হ্যাঁ।

তারপর? পাখার নিচে ঘামতে শুরু করেছে মনসুর।

তারপর সেখানে দু-মাস ছিলাম আমরা— মরিয়ম মৃদু গলায় বললো, টাকাপয়সা সব ফুরিয়ে গিয়েছিল, ভীষণ কষ্টে দিন কাটছিলো আমাদের। তারপর একদিন— বলতে গিয়ে

ইতস্তত করলো মরিয়ম, তারপর একদিন আমাকে সেখানে একা ফেলে, কোথায় যেন চলে গেলো জাহেদ, আর ফিরলো না। বলতে গিয়ে, এতক্ষণে চোখজোড়া পানিতে টলটল করে উঠলো তার।

মরিয়মের কথা শেষ হয়ে গেলে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো ওরা। পাখাটা ঘুরছে মাথার ওপর। ঘরের মধ্যে শুধু তার বনবন শব্দ। কারো দিকে কেউ তাকালো না ওরা। কী এক নির্বিকার নীরবতায় দুজনে ডুবে গেলো। পরস্পরের মনে হলো, অনেকক্ষণ পরে বহুদূর থেকে যেন মনসুর জিজ্ঞেস করছে তাকে, জাহেদকে কি সত্যি ভালোবাসতে তুমি।

মরিয়ম মাথা নোয়ালো— হ্যাঁ।

এখনো ভালোবাসো? দ্বিতীয় প্রশ্ন।

মরিয়ম মাথা নাড়লো— না।

মনসুরের মনে হলো মিথ্যে কথা বলছে মেয়েটা।

সে রাতে আর কোনো কথা হলো না।

মরিয়ম লক্ষ করেছে, সারারাত ঘুমোতে পারেনি লোকটা।

পরদিন সকালে, মাঝেমাঝে তাল ভঙ্গ হয়ে গেলেও আগের মতো ব্যবহার করলো মনসুর। বাইরে বেরুবার সময় রোজকার মতো দুহাতে ওকে আলিঙ্গন করে মৃদু গলায় বললো, কাজটা সেরে আসি, কেমন? মরিয়ম ওর মুখের কাছে মুখ এনে মিষ্টি হেসে বললো, এসো।

কিন্তু দুপুরে আবার যখন ফিরে এলো মনসুর, তার মুখখানা তখন আবার ভার হয়ে গেছে। সারামুখে চিন্তার ছায়া। বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলো সে। খাওয়ার পরে, বিছানায় বিশ্রাম নেবার সময় বারকয়েক এপাশ-ওপাশ করে হঠাৎ সে উঠে বসে বললো, তুমি আমাকে ভালোবাসো মরিয়ম? গলাটা অদ্ভুত শোনালো ওর।

মরিয়ম পাশে বসেছিলো। চমকে তাকালো ওর দিকে। মৃদু হেসে জবাব দিলো, কেন তোমার কী সন্দেহ হচ্ছে?

মনসুর মৃদু গলায় বললো, না। ক্ষণকাল চুপ থেকে আবার প্রশ্ন করলো, তুমি জাহেদকেও ভালোবাসতে, তাই না? তার কণ্ঠস্বরে অস্থিরতা।

মরিয়ম দৃষ্টিটা ওর ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে বললো, হ্যাঁ।

অন্যদিন এ-সময়ে বেরুতো না মনসুর, সেদিন বেরিয়ে গেলো। যাবার সময় মরিয়ম জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাচ্ছো?

মনসুর ইতস্তত করে দু-হাতে কাছে টেনে নিলো ওকে। তারপর বললো, কাজ আছে।

বিকেলে সে ফিরলো না, ফিরলো সে অনেক রাত করে। কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়।

মরিয়ম জিজ্ঞেস করলো, খাবে না?

সে বললো, মাথা ধরেছে, কিছু ভালো লাগছে না আমার।

কপালটা টিপে দেব?

না।

সারারাত যন্ত্রণায় ছটফট করেছে মনসুর।

পরদিন চায়ের টেবিলে বসে হঠাৎ সে প্রশ্ন করলো, সত্যি করে বলো তো ম্যারি, তুমি কাকে বেশি ভালোবেসেছো? জাহেদকে না আমাকে?

চায়ের কাপটা মুখের কাছে এনে নামিয়ে রাখলো মরিয়ম। একঝলক চা ঢলকে পড়ে গেলো পিরিচের ওপর, মৃদুস্বরে সে জবাব দিলো, জানি না।

ভ্রুজোড়া অদ্ভুতভাবে বাঁকালো মনসুর। তারপর আস্তে করে বললো, তোমার কি মনে হয়, মানুষ দুবার প্রেমে পড়তে পারে?

বিব্রত মরিয়ম বললো, পারে।

বাজে কথা। চায়ের কাপটা সামনে ঠেলে দিয়ে উঠে পড়লো মনসুর। লম্বা সোফাটার উপর শুয়ে পড়ে দু-হাতে কপালটা চেপে ধরলো সে। আবার মাথা ধরেছে।

সেদিন বিকেলে লিলি এলো বাসায়।

ভাই আর ভাবীর সঙ্গে ঝগড়া করে বাসা ছেড়ে দিয়েছে সে।

শঙ্করটোলা লেনে একটা ঘর নিয়েছে থাকবে বলে— সে কথা মরিয়মকে জানাতে এসেছিলো লিলি। ওর ম্লান মুখ দেখে অবাক হলো সে। বললো, তোমার কি অসুখ করেছিলো ম্যারি?

কই নাতো। মরিয়ম ঘাড় নাড়লো।

লিলি বললো, তুমি ভীষণ শুকিয়ে গেছো।

মরিয়ম হাসতে চেষ্টা করলো, তাই নাকি?

লিলি বললো, হ্যাঁ।

সেদিন অনেকক্ষণ দুজনে গল্প করেছিলো ওরা। বাইরে ছোট্ট লনটিতে দুটো বেতের চেয়ার বের করে মুখোমুখি বসেছিলো।

লিলি বললো, হাসিনা এসেছিলো?

মরিয়ম বললো, মাঝখানে দিন-চারেক সে থেকে গেছে এখানে, তারপর আর আসেনি।

আর কেউ আসে না?

বাবা এসেছিলেন একদিন। খোকন আসে মাঝেমাঝে।

তোমার দাদা?

না। বলতে গিয়ে একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস পড়লো তার। মাহমুদ যে আসবে না সেটা জানতো মরিয়ম।

ধীরেধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিলো। আকাশে তারারা জ্বলে উঠেছিল একে-একে। স্নিগ্ধ বাতাস বইছে সবুজ লনের ওপর দিয়ে। অন্ধকারে ওরা নিজেকে আর সংবরণ করে রাখতে পারলো না। দিনকয়েক ধরে যা ঘটেছে সে-সব খুলে বললো লিলিকে।

শুনে লিলি মন্তব্য করলো, তুমি এত বোকা তাতো জানতাম না ম্যারি।

মরিয়ম শুধালো, কেন?

লিলি বললো, সবকিছু এভাবে খুলে বলতে গেলে কেন ওকে?

মরিয়ম বললো, মিথ্যে তো বলিনি।

লিলি হাসলো, অত সত্যবাদী হতে নেই ম্যারি। এ সমাজে বাঁচতে হলে মিথ্যের মুখোশ পরে চলতে হয়।

মরিয়ম অবাক হয়ে বললো, কেন?

কেন তা টের পাবে। ধীরে জবাব দিলো লিলি।

ক্ষণকাল চুপ থেকে মরিয়ম বললো, মানুষ কি দুবার প্রেমে পড়তে পারে না? একজনকে হারিয়ে সেকি অন্য আরেকজনকে ভালোবাসতে পারে না?

পারে। দু-বার কেন দশবার পারে। লিলি বললো, কিন্তু সেটা কেউ স্বীকার করে না। যেমন আমার কথাই ধরো না। তুমি তো জানো, দুটি ছেলেকে ভালোবাসি আমি। এক ছিলো খুব ভালো অভিনেতা, আরেকজন ছিলো গায়ক। সেসব অতীতের কথা, তাই বলে ভবিষ্যতে আমি কাউকে ভালবাসবো না তাতো নয়। হয়তো ভালোবাসবো, কিন্তু ওদের কারো কথা আমি বলবো না তাকে।

অন্ধকারে শব্দ করে হেসে দিলো মরিয়ম।

লিলি বললো, তুমি হাসছো ম্যারি। বড় সরল মেয়ে তুমি। এ সমাজের কিছুই জানো না।

অনেক রাত হয়ে গেছে বলে উঠে পড়লো লিলি। একদিন তার নতুন ঘরটা গিয়ে দেখে আসতে অনুরোধ করলো। মরিয়ম খেয়ে যাবার জন্যে ধরেছিল। লিলি জানালো, অন্য আরেকদিন এসে খাবে সে, আজ নয়।

কয়েকদিন পরে। সেটা বোধহয় রোববার ছিলো। বারান্দায় বসেছিলো ওরা।

মরিয়ম একটা বই পড়ছিলো আর মনসুর সেদিন ডাকে-আসা কয়েকখানা চিঠি দেখছিলো বসে। চিঠিগুলো পড়া শেষ হলে হঠাৎ সে বললো, আচ্ছা মরিয়ম—। মরিয়ম চোখ তুলে তাকালো।

জাহেদের ব্যাপারটা তুমি আমাকে আগে বলোনি কেন?

তুমি জিজ্ঞেস করোনি বলে। আবার বই-এর মধ্যে মুখ নামালো মরিয়ম।

আবার মনসুরের গলা— লুকোওনি তো?

মরিয়ম চমকে উঠলো। বইটা বন্ধ করে রেখে সোজা ওর চোখের ওপর দৃষ্টি ফেললো সে। তারপর মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলো, তোমার কী হয়েছে বলো তো?

না কিছু না। চিঠিগুলো হাতে নিয়ে ভেতরে চলে গেলো মনসুর। একটা তীব্রদৃষ্টি হেনে গেলো যাবার সময়। দু-হাতে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ফেললো মরিয়ম।

বিয়ের তিনটি মাসের শেষ মাসটি এমনি করে কেটেছে তার। ক্যালেন্ডারের সামনে দাঁড়িয়ে মরিয়ম ভাবছিলো দিনগুলো কেমন করে অত তাড়াতাড়ি কেটে গেলো।

আয়ার ডাকে চমক ভাঙলো তার। আপনার ভাই এসেছে গো, দেখুন। মরিয়ম তাকিয়ে দেখলো, দোরগোড়ায় খোকন দাঁড়িয়ে।

ছুটে এসে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলো সে। চিবুক ধরে আদর করলো তাকে— কিরে খোকন, স্কুলে যাসনি আজ।

খোকন বললো, না স্কুল ছুটি হয়ে গেছে।

মরিয়ম বললো, মা কেমন আছেরে?

প্যান্টের পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে মরিয়মের হাতে দিলো খোকন। বললো, মা দিয়েছে এটা।

মরিয়ম খুলে দেখলো হাসিনার হাতের লেখা। দশটা টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন মা। বড় দরকার।

চিঠিটা পড়ে ব্লাউজের মধ্যে রেখে দিলো সে। দুপুরে খেয়ে যাবে তুমি, এখন বসো। তোমার দুলাভাই আসুক, তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে দেবো।

বসে বসে খোকনকে অনেকক্ষণ এটা-সেটা জিজ্ঞেস করলো মরিয়ম। দুলু কি তার কথা বলে? হাসিনা কেমন আছে? আর ভাইয়া? বাবার শরীর ভালোতো? তসলিম কি এখনো হাসিনাকে ছবি তোলা শেখায়? কাল রাতে কী রান্না হয়েছিলো ওদের? সকালে কী নাস্তা করেছে সে?

খোকনকে কাছে পেয়ে বড় ভালো লাগছিলো মরিয়মের।

দুপুরে মনসুর ফিরে এলে বললো, দশটা টাকা দিতে পারো?

মনসুর ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, কেন বলো তো?

মরিয়ম কোনো জবাব দেবার আগেই খোকনের দিকে চোখ পড়ল তার। ওর দিকে একপলক তাকিয়ে সে আবার বললো, তোমার বাপের বাড়ি থেকে টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে বুঝি?

ওর কথা বলার ধরন দেখে ক্ষুণ্ণ হলো মরিয়ম। ইতস্তত করে বললো, ধার চেয়েছেন, মাস এলে শোধ করে দেবেন।

ওসব ন্যাকামো করো না বলতো? মনসুরের কণ্ঠে উষ্মা। এ তিনমাসে কম টাকা নেয়নি ওরা, একপয়সা শোধ দিয়েছে? বলতে বলতে পকেট থেকে ব্যাগটা হাতে নিয়ে একখানা দশটাকার নোট বের করলো সে। তারপর নোটখানা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে আবার বললো, দশটা টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে বললেই তো হয়—নাও। তার কণ্ঠে তাচ্ছিল্যের সুর। নোটখানা হাত থেকে উড়ে মাটিতে পড়ে গেলো। মরিয়ম পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর উপুড় হয়ে ওটা তুলে নিলো হাতে।

খোকনকে বিদায় দেবার সময়, কাছে টেনে আদর করলো মরিয়ম। তারপর কানে কানে বলে দিলো মাকে কিছু বলো না, কেমন? আবার এলে টফি দেবো তোমায়।

খোকন মাথা নেড়ে সায় দিলো।

এতক্ষণ কিছু বলার জন্যে উসখুস করলো মনসুর। ও চলে যেতে বললো, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, উত্তর দেবে? ঈষৎ লাল চোখজোড়া মেলে তাকালো সে।

ছড়ানো চুলগুলো খোঁপায় বন্ধ করতে করতে মরিয়ম বললো, বলো।

মনসুর চিন্তা করছিলো বলবে কি না। অবশেষে বললো, তুমি কি আমাকে সত্যি ভালোবেসেছিলে, না আমার টাকার প্রতিই আকর্ষণ ছিলো তোমার?

চোখজোড়া বড় বড় করে ওর দিকে তাকালো মরিয়ম। তারপর ডুকরে কেঁদে উঠলো সে। আমরা গরিব বলে আজ এত বড় কথা বলতে পারলে তুমি। অত অবিশ্বাস যদি মনে ছিলো তবে বিয়ে করলে কেন?

তখন কি আমি জানতাম যে, তোমার ওই দেহটা তুমি আরেকজন পুরুষের হাতে তুলে দিয়েছিলে? তিক্ত গলায় ফেটে পড়লো মনসুর— সে লোকটা সারা দেহে চুমো দিয়েছে তোমার, রাক্ষসের মতো ভোগ করেছে, আর তুমি দু-হাতে তাকে আলিঙ্গন করেছো, গভীর তৃপ্তিতে তার বুকে মুখ গুঁজেছ, ভাবতে ঘেন্না লাগে, বমি আসে আমার। একটুকাল দম নিয়ে সে আবার বললো, আমি তোমাকে কুমারী বলে জানতাম আর আমার সরলতার সুযোগ নিয়ে আমাকে তুমি ঠকিয়েছো।

উহ্ আর না, আর বলো না, দোহাই তোমার এবার থামো। আর সহ্য হচ্ছে না আমার। সারা দেহটা কান্নায় দুলছিলো মরিয়মের। মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে দু-হাতে মুখখানা ঢেকে রাখলো সে। খোঁপাবদ্ধ চুলগুলো সারা পিঠে ছড়িয়ে পড়লো কালো হয়ে। মনসুর তখনো হাঁপাচ্ছে।

আজ দুপুরে আমেনারা চলে যাবে। অনেক করে বলে গেছে শাহাদাত— কাল সময় করে একবার এসো। এইতো শেষদিন তোমাদের শহরে। এসো কিন্তু।

প্রেসটা বিক্রি করে দিয়েছে ওরা। ভৈরবে একটা স্টেশনারি দোকান কিনেছে। প্রেসের মালিক অবশেষে স্টেশনারি দোকানের মালিক হতে চললো।

কাউন্টারে বসে-বসে জিনিসপত্র বিক্রি করবে শাহাদাত, তবু কারো চাকরি সে করবে না। আমেনা চায় না তার স্বামী কারো গোলামি করুক।

শুনে মাহমুদ বলেছিল, দোকান কিনেছো ভালো কথা। কিন্তু ভৈরব কেন ? ঢাকায় কিনতে পারলে না ?

পেলে নিশ্চয় কিনতাম। জবাবে বলেছে শাহাদাত— ওখানে সস্তায় পাওয়া গেলো তাই।

কথাটা যে সত্য নয় সেটা বুঝতে বিলম্ব হয়নি মাহমুদের, ভৈরব দোকান কেনার পেছনেও রয়েছে আমেনার অদৃশ্য ইঙ্গিত। সে চায় না তাদের এই ক্ষয়ে-ক্ষয়ে তলিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা সকলে দেখুক, উপভোগ করুক- বিশেষ করে তার ভাইয়েরা, তাদের পরিচিত বন্ধুবান্ধবেরা। ওদের চোখের কাছ থেকে নিজের দীনতাটুকু আড়াল করে রাখতে চায় আমেনা। ভৈরবে পরিচিত কেউ নেই। সেখানকার সকলে নতুন পরিচয়ে জানবে তাকে, জানবে দোকানির বউ বলে। এককালে সে প্রেসমালিকের বউ ছিলো, তার ভাইয়েরা এখনো রাস্তায় মোটর হাকিয়ে বেড়ায়— এ খোঁজ কাউকে দেবে না আমেনা।

মাহমুদ এসে দেখলো জিনিসপত্রগুলো সব ইতিমধ্যে বেঁধেছেঁদে নিয়েছে ওরা। একটা পুরনো ট্রাঙ্ক, দুটো স্যুটকেস— একটা চামড়ার, আরেকটা টিনের। তিনটে বস্তার মধ্যে টুকিটাকি মাল। কাঠের আসবাবপত্রগুলো পাড়ার একজনের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে শাহাদাত। এগুলো সঙ্গে নেয়া যাবে না, পথে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। ভৈরব গিয়ে মিস্ত্রি দিয়ে নতুন করে আবার বানিয়ে নিতে হবে সব।

শাহাদাত বসে বসে একটা বস্তার মুখ সেলাই করছিলো।

আমেনা আঙিনায় ছেলেমেয়েদের গোসল করাচ্ছে।

মাহমুদ বললো, আমার আসতে দেরি হয়ে গেলো, তোমরা তৈরি হয়ে আছো দেখছি।

শাহাদাত মুখ তুলে মৃদু হাসলো। হেসে বললো, বসো। একটু পরে ঠেলাগাড়িওয়ালা আসবে। ট্রেনেরও বোধহয় সময় হয়ে এলো।

মাহমুদ বসলো।

গত সাতবছর ধরে এখানে আছে ওরা, এই বাসাতে।

আজ ছেড়ে চলে যাবে।

তারপর এ পথে হয়তো আর আসবে না মাহমুদ। এলে ওদের বাসাটার দিকে চোখ পড়লে নিশ্চয় ভীষণ খারাপ লাগবে ওর।

মিছেমিছি তুমি দোকান দিচ্ছ শাহাদাত। মাহমুদ একসময় বললো, একদিন সেটাও বিক্রি করে দিতে হবে।

কেন কেন ? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো শাহাদাত।

মাহমুদ বললো, সেখানেও সবাইকে ধারে জিনিসপত্র দিতে শুরু করবে তুমি। তারপর যখন কেউ আর ধার শোধ করতে চাইবে না তখন দেখবে দোকান শূন্য। মাল নেই।

উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিলো শাহাদাত।

আমেনা এলো ভেতরে।

মাহমুদ বললো, ওর মধ্যে অনেক পরিবর্তন তুমি এনেছো আমেনা, আর এই বিশ্রী স্বভাবটা বদলাতে পারলে না।

কি কোন্ স্বভাবের কথা বলছো ? আমেনার দু-চোখে কৌতুক।

মাহমুদ বললো, লোককে ও বিশ্বাস করে। বড় বেশি ধার দেয়।

আমেনা কোনো উত্তর দেবার আগে শব্দ করে হেসে উঠলো শাহাদাত। বক্তার মুখটা ভালোভাবে বন্ধ করে দিয়ে, উঠে দাঁড়িয়ে ও বললো, কার কাছে অভিযোগ করছো মাহমুদ। এ স্বভাবটা আমার ওর কাছে পাওয়া।

আমেনা ততক্ষণে আবার বাইরে বেরিয়ে গেছে। মাহমুদ ধীরেধীরে বললো, স্বভাবটা যারই হোক, নিশ্চয় এটা খুব ভালো স্বভাব নয়। দুনিয়াটা হলো কতগুলো স্বার্থপরের আড্ডাখানা। অন্যকে দিয়ে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারো তুমি, কিন্তু প্রয়োজনে কারো কাছ থেকে একটা কানাকড়িও পাবে না।

ম্লান হাসলো শাহাদাত। তারপর গম্ভীর হয়ে বললো, তোমার উক্তির সত্যতা নিয়ে আমি তর্ক করতে চাইনে মাহমুদ। দুনিয়াটা কতগুলো স্বার্থপরের আড্ডাখানা— এ-কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে আমি রাজি নই। আজ এই বিদায়ের মুহূর্তে আর পাঁচটা কাজ ফেলে তুমি-যে এখানে এসেছো, এর পেছনে কোনো স্বার্থ আছে বলতে চাও ? নেই, জানি। জানি বলেই তো এখনো বেঁচে আছি নইলে—। বলতে গিয়ে থেমে গেলো শাহাদাত। গলাটা ধরে এসেছে ওর। চোখের কোণে দু'ফোঁটা মুক্তোর মতো চিকচিক করছে।

বিব্রত মাহমুদ, বড় ট্রাঙ্কটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলো। স্টেশনে এসে ট্রেন ছাড়বার আগমুহূর্তে মাহমুদের হাত ধরে শাহাদাত বললো, চিঠিপত্র লিখো মাহমুদ, আর যদি পারো একবার গিয়ে বেরিয়ে এসো।

মাহমুদ কিছু বলতে পারলো না, মাথা নেড়ে সায় দিলো শুধু। জানালার ধারে বসে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে আমেনা। পাশে তার ছেলেমেয়েরা। পান খেয়ে ঠোঁট-জোড়া লাল করেছে সে। কালো ছোট্ট একটা টিপ। শাড়ির আঁচলখানা খোঁপা পর্যন্ত তোলা। আজ হঠাৎ সুন্দর করে সেজেছে আমেনা।

সামনে এগিয়ে মাহমুদ বললো, আবার দেখা হবে আমেনা।

আমেনা লাল ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে বললো, একবার বেড়াতে এসো কিন্তু, নেমন্তন্ন রইলো।

মাহমুদ আস্তে করে বললো, আসবো।

একটু পরে ট্রেন ছেড়ে দিলো। ওদের মুখখানি ধীরেধীরে মিলিয়ে গেলো চোখের আড়ালে।

খবরটা খোদাবক্সের কাছ থেকে পেয়েছিলো মাহমুদ।

একটা কনট্রাক্টরের সঙ্গে কাজে লেগে গেছে রফিক।

সকাল থেকে সন্ধ্যা মজুরদের সঙ্গে বসে-বসে ওদের কাজের তদারক করা, কতদূর কাজ হলো দেখা। হিসেব নেয়া আর কেউ কাজ না করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে তাকে ধমকিয়ে কাজ আদায় করা।

খোদাবক্স বলেছিলো, ওর ইচ্ছে ছিলো—লেখাপড়া-জানা মানুষ লেখাপড়ার চাকরি করবে। তা বেকার বসে থাকার চেয়ে এটাও মন্দ কিসের, কী বলেন, মাহমুদ সাহেব ?

মাহমুদ সায় দিয়ে বলেছিলো, হ্যাঁ, অফিস-কেরানিগিরি করার চেয়ে এ চাকরি ঢের ভালো।

তারপর থেকে বেশ ক-দিন আর রফিকের দেখা পাওয়া যায়নি। সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকে ও। রাস্তা মেরামতের কাজ চলছে এখন। আজ বিশ্রামাগারে আসার পথে ওর কথা ভাবছিলো মাহমুদ। হয়তো ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। দেখা হলে বিয়ের কতদূর কী করলো জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু বিশ্রামাগার পর্যন্ত আসতে হলো না। পথেই দেখা হয়ে গেলো গায়ে আধময়লা একটা জামা, তার চেয়েও ময়লা একটা পায়জামা, পায়ে টায়ারের স্যান্ডেল। কাজ শেষে ফিরছে সে।

দেখা হতে একগাল হেসে বললো, মনে মনে তোমার কথাই ভাবছিলাম মাহমুদ।

আমার কথা তুমি ইদানীং বড় বেশি ভাবছো। মাহমুদ জবাব দিলো পরক্ষণে।

পথ চলতে চলতে রফিক আবার বললো, তুমি ইচ্ছে করলে আমার একটা ভালো চাকরি নিয়ে দিতে পারতে মাহমুদ। যাকগে, চাকরি এক জুটিয়েছি মন্দ না, ভালোই।

টেলিগ্রামের তারে বসে একটা কাক কা-কা শব্দে ডাকছে একটানা। সেদিকে তাকিয়ে থেকে মাহমুদ বললো, তুমি চাকরি চেয়েছিলে, একটা পেয়েছো, আবার কী ?

রফিক বললো, এবার ওকে বিয়ে করে ঘর বাঁধবো আমি। তোমরা দেখো, আমি খুব সুখী হবো। বলতে গিয়ে মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার। হঠাৎ সে প্রশ্ন করলো, তুমি বিয়ে করছো না কেন মাহমুদ ?

চলার পথে হোঁচট খেলো মাহমুদ, হঠাৎ আমার সম্পর্কে ভাবতে শুরু করছো কেন ? নিজের কথা ভাবো।

রফিক চুপসে গেলো।

খানিকক্ষণ নীরবে পথ হাঁটলো ওরা।

নীরবতা ভেঙে রফিক সহসা বললো, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিলো আমার।

বলো।

এবার তুমি আমায় হতাশ করবে না কথা দাও।

অমন কথা আমি দেইনে। মাহমুদের গলা বিরক্তিতে ভরা।

রফিক বললো, তাহলে আর বলে কী লাভ।

মাহমুদ বললো, না বলাই ভালো।

কিন্তু না বলে থাকতে পারলো না রফিক। না বলার অনেক চেষ্টা করলেও অবশেষে বলতে হলো— শোনো মাহমুদ, মেয়েদের স্কুলের লিলি মাস্টারনির সঙ্গে শুনেছি তোমার নাকি বেশ আলাপ আছে।

কার কাছ থেকে শুনেছো ? ওর কথাটা শেষ হবার আগেই গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলো মাহমুদ।

রফিক ইতস্তত করে বললো, কেন সবাই জানে। খোদাবক্স বলেছিলো সেদিন বিকেলে মেয়েটা নাকি স্কুল থেকে বেরিয়ে ওখানে খোঁজ করছিলো তোমার।

বাজে কথা, একেবারে মিথ্যে কথা। মাহমুদ উত্তেজিত গলায় বললো, খোদাবক্স বানিয়ে বলেছে তোমাদের।

তা নাহয় বলেছে। কপালের ঘাম মুছে নিয়ে রফিক আবার বললো, কিন্তু মেয়েটার সঙ্গে যে তোমার আলাপ আছে তা কি সত্যি নয়।

মাহমুদ বললো, হ্যাঁ সত্যি, কিন্তু তোমার সেটা নিয়ে এত মাথা ঘামানো কেন ?

আছে বন্ধু আছে, নইলে কি আর মিছেমিছি মাথা ঘামাচ্ছি ? রফিক হেসে দিয়ে বললো। ভাই এবার আমার কথাটা রাখো ভালোই হবে তোমার। আজ ক'দিন ধরে ওর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। আগে দাইগুলোর হাতে হাতে চিঠি পাঠাতাম। এই দাইগুলো, বুঝলে, একনম্বরের বজ্জাত। একটা চিঠির জন্য দুটো করে টাকা নিতো। সেও ভালো ছিলো, এখন নেয়াই বন্ধ করে দিয়েছে, বলে 'ডর লাগতী, নোকরি চলি যায়গী।'

মাহমুদ বাধা দিয়ে বললো, ওসব শুনে কী হবে আমার। আমার কিছু করবার থাকলে তাই বলো।

তাইতো বলছি মাহমুদ। তুমি বন্ধু, বন্ধুর দুঃখ বুঝবে। সলজ্জ সঙ্কোচের সঙ্গে রফিক বললো, তোমার সেই লিলি মাস্টারনির হাতে যদি আমাদের চিঠিপত্রগুলো— কথাটা শেষ করতে পারলো না রফিক। মাহমুদের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলো সে। কে যেন আলকাতরা লেপে দিয়েছে ওর চোখেমুখে। একটু পরে মৃদুগলায় সে বললো, ওসব ইয়ার্কি আমার ভালো লাগে না বুঝলে ?

রফিক কাতর গলায় বললো, তোমার কি আমার জন্যে এতটুকু অনুভূতিও নেই মাহমুদ ?

মাহমুদ জবাব দিলো, না।

রফিক বললো, এই বুঝি তোমার বন্ধুত্ব ?

মাহমুদ বললো, হ্যাঁ।

ততক্ষণে তারা বিশ্রামাগারের চৌকাঠে এসে পা রেখেছে।

আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামবার আগে, শঙ্করটোলা লেনে লিলির নতুন বাসাটা খুঁজে বের করলো মরিয়ম। ওকে বাসায় পাওয়া যাবে কিনা ভাবছিলো সে। এসে দেখলো সবে বাইরে থেকে ফিরেছে লিলি। মুখহাত ধুয়ে, স্টোভে আগুন জ্বালাচ্ছে। ওকে দেখে, কেতলিতে আরেক কাপ আন্দাজ পানি ঢেলে স্টোভের ওপর চড়িয়ে দিলো লিলি।

বাইরে তখন বৃষ্টি নেমেছে।

লিলি বললো, ঠিক সময়ে এসে পৌঁছে গেলে তুমি, নইলে ভিজতে হতো। মরিয়ম বললো, আরো আগে এসে পৌঁছতাম, তোমার ঠিকানাটা খুঁজে বের করতে দেরি হয়ে গেছে।

তাকের ওপর থেকে চায়ের কৌটোটা নামিয়ে নিয়ে লিলি বললো, এই একটু আগে তোমার কথা ভাবছিলাম আমি। ভাবছিলাম কাল সকালে তোমার ওখানে যাবো। ওকে চুপ থাকতে দেখে লিলি আবার বললো, আজ দুপুরে তোমার দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো রাস্তায়।

তাই নাকি ? অন্যমনস্ক গলায় বললো মরিয়ম।

লিলি বললো, হ্যাঁ। তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন তিনি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নীরবে জ্বলন্ত স্টোভটার দিকে তাকিয়ে রইলো মরিয়ম।

কেতলির ঢাকনাটা তুলে একমুঠো চায়ের পাতা ঢেলে দিয়ে লিলি আবার বললো, তোমার কী খবর ?

সহসা কোনো জবাব দিলো না মরিয়ম।

লিলি উঠে দাঁড়িয়ে সস্নেহে একখানা হাত রাখলো ওর কাঁধের ওপর—ও কি এখনো আগের মতো ব্যবহার করছে ?

তবু কিছু বললো না মরিয়ম। ডাগর চোখজোড়া ধীরেধীরে জলে ভরে এলো তার। কান্না চেপে মৃদুগলায় বললো, আগের মতো হলে ভালোই ছিলো লিলি। আজকাল সে কি আর মানুষ আছে, অমানুষ হয়ে গেছে। বলতে গিয়ে চোখ উপচে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো তার।

ওকি, কাঁদছো কেন ? হাত ধরে বিছানায় এনে ওকে বসালো লিলি—কেঁদে কী হবে।

জানি কেঁদে কিছু হবে না। মরিয়ম ধীরেধীরে বললো, জীবনটা আমার এমন হলো কেন লিলি? এমনটি হোক, তাতো আমি চাইনি কোনোদিন।

নিজহাতে তুমি নিজের সুখ নষ্ট করেছো ম্যারি। কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলো লিলি।

মরিয়ম নীরবে মাটির দিকে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, গত দু-দিন সে বাসায় আসেনি। ওর কণ্ঠস্বরে হতাশা।

লিলি ওর মুখের দিকে চেয়ে শুধালো, একেবারেই আসেনি ?

মরিয়ম সংক্ষেপে বললো, না।

স্টোভের ওপর থেকে কেতলি নামিয়ে নিয়ে আগুনটা নিভিয়ে দিলো লিলি। তারপর তাকের ওপর থেকে দুটো চায়ের পেয়ালা আর চিনির কৌটোটা মেঝেতে নামিয়ে রাখলো সে।

মরিয়ম বললো, আমি চা খাবো না লিলি।

লিলি অবাক হয়ে শুধালো, কেন ?

খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলো মরিয়ম। তারপর ম্লান গলায় বললো, আজ দু-দিন সে বাসায় আসেনি। তুমি কি ভাবছো এ দু-দিন কিছু মুখে দিতে পেরেছি আমি ? বলতে গিয়ে কান্নায় গলাটা ভেঙে এলো তার।

লিলি কী বলে সান্ত্বনা দেবে ভেবে পেলো না। পাশে এসে বসে বিব্রত গলায় বললো, ওরজন্যে নিজেকে এমন করে কষ্ট দিচ্ছো কেন ম্যারি ?

মরিয়ম কোনো উত্তর খুঁজে না পেয়ে লিলির কোলে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ কাঁদলো। জড়ানো স্বরে বললো, আমি কী পাপ করেছিলাম বলতে পারো লিলি ? বলতে পারো আমার

কপালটা এমন হলো কেন ? কেতলিটা ধীরেধীরে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো ওদের, কারো চা খাওয়া হলো না।

বাসায় ফেরার কিছুক্ষণ পরেই, দোরগোড়ায় মনসুরের পায়ের শব্দে চমকে উঠলো মরিয়ম। আনন্দ ও আতঙ্ক দুটোই এসে একসঙ্গে জড়িয়ে ধরলো তাকে।

ওকে দেখে মনসুর বিস্ময়ের ভান করলো, তুমি এখনো আছো ? অদ্ভুতভাবে ভ্রুজোড়া বাঁকালো সে।

না থাকলেই কি তুমি খুশি হতে ? গলাটা কাঁপছিলো মরিয়মের। ঘরের মাঝখানে, টিপয়টার চারপাশে সাজানো সোফার ওপর বসে অকম্পিত স্বরে মনসুর জবাব দিলো, এ সহজ কথাটা কি আর বোঝো না তুমি ?

ওর প্রতিটি কথা তীরের ফলার মতো এসে বিঁধলো তার বুকে। ওর মুখের ওপর জোর করে দৃষ্টি সরিয়ে নিলো মরিয়ম। যে-মুখে অত বড় উচ্চারণ করেছে মনসুর, সে-মুখের দিকে একটিবারও আর ফিরে তাকাবে না সে।

তবু তাকাতে হলো।

তবু ওর পাশে এসে দাঁড়ালো মরিয়ম। হাঁটু গেড়ে বসে আশ্চর্য কোমল গলায় শুধালো, আমি চলে গেলে সত্যি খুশি হবে ? মনসুর উঠে দাঁড়িয়ে অন্য সোফায় গিয়ে বসলো। তারপর জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে বিকৃতকণ্ঠে বললো, সত্যি তোমার লজ্জা-শরম বলতে কিছু নেই ?

অকস্মাৎ কোনো জবাব দিতে পারলো না মরিয়ম। সারামুখ আরো ম্লান হয়ে এলো তার। নীরবে, মেঝেতে বিছানো কার্পেটের ওপর হিজিবিজি কাটতে কাটতে অবশেষে আস্তে করে বললো, তাহলে তাই হবে, তুমি যা চাও তাই করবো আমি। ওর কথাগুলো মনসুর শুনতে পেলো কিনা বোঝা গেলো না।

ক'দিন ধরে শুধু বৃষ্টি, বৃষ্টি আর বৃষ্টি।

মাঝেমাঝে একটু থামে, হয়তো ঘন্টাখানেকের জন্যে, তারপর আবার আকাশ কালো করে নেমে আসে ঝপঝপ শব্দে।

একটানা বৃষ্টি হলে কাটলগুলো চুঁইয়ে সারাঘরে টপটপ পানি পড়ে। এ-ঘরে সে-ঘরে হেঁটে সালেহা বিবি দেখছিলেন কোথায় কোথায় পানি পড়ছে। একটি করে মাটির পাত্র বসিয়ে দিয়ে গেলেন তিনি।

হাসিনা বললো, বাড়িওয়ালাকে ডেকে ঘরটা মেরামত করে দিতে বলো না কেন ?

সালেহা বিবি বললেন, তোর দুলাভাই বলেছে এ-মাসের মধ্যে একটা বাড়ি দেখে, নিয়ে....আর মেরামতের জন্যে গা লাগাননি।

হাসিনা বললো, কবে যে এ-বাড়ি থেকে যাবো, একটু ছাতেও উঠতে পারিনে।

সালেহা বিবি পানি পড়ার জায়গাগুলো লক্ষ করতে করতে বললেন, মাহমুদটার জন্যে, নইলে এতদিনে তোর দুলাভাই এখান থেকে নিয়ে যেতো আমাদের।

হাসিনা ঠোঁট বাঁকিয়ে বললো, ভাইয়াটা যে কী !

কথাটা কানে গেলে নিশ্চয় একটা কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে দিতো মাহমুদ। এমনিতে কম হৈচৈ করেনি সে। মাকে ডেকে নিয়ে বলেছে, দেখো মা, তোমার জামাইকে বড় বেশি

কৃপা দেখাতে নিষেধ করো। আমরা গরিব হতে পারি, কৃপার পাত্র নই। এ পাড়ার আরো পাঁচশো পরিবার এমনি ভাঙাচোরা বাড়িতে থাকে। তোমার জামাই পারবে তাদের সবার জন্য নতুন বাড়ির বন্দোবস্ত করে দিতে ? আমাদের ওপর অত বদান্যতা কেন ? মেয়ে বিয়ে দিয়েছো বলে ?

দেখ মাহমুদ, সব কাজে তোর এই রেয়াড়াপনা ভালো লাগে না আমার বুঝলি ? তীব্র গলায় ওকে আক্রমণ করেছেন মা—একপয়সার মুরদ নেই, মুখে শুধু বড় বড় কথা।

আরো অনেকক্ষণ কথা কাটাকাটি করছে ওরা। কিন্তু এ-ধরনের তর্কের সহজে মীমাংসা হয় না। হয়ও নি।

মাহমুদের ঘরে পানি পড়ছিলো। ওর বইপত্রগুলো আর বিছানাটা একপাশে টেনে রেখে যেখানে-যেখানে পানি পড়ছিলো সেখানে একটা করে মাটির পাত্র বসিয়ে দিলেন সালেহা বিবি। একরাশ সুড়কির গুঁড়ো ঝরে পড়লো ওঁর সামনে। সালেহা বিবি উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন কোত্থেকে পড়লো। তারপর চিন্তিত-মুখে চলে গেলেন সেখান থেকে।

সারা সকাল বৃষ্টি হলো। সারা দুপুর।

বিকেলের দিকে মেঘ সরে গিয়ে আকাশে সূর্য উঁকি দিলো। সোনালি রোদ ছড়িয়ে পড়লো দিগন্তে।

তসলিম এসেছিলো। তাকে নিয়ে পা টিপে টিপে ছাতে ওঠে হাসিনা। আকাশের ছবি নেবে।

তসলিম বললো, তোমার ক্যামেরা কেনার কী হলো ?

হাসিনা বললো, দুলাভাই বলছিলেন বাজারে এখন ভালো ক্যামেরা নেই, এলে কিনে দেবেন উনি।

কিনে দেবেন না ছাই— ছাতে এসে তসলিম বললো, বাজারে কত ক্যামেরা, আমাকে টাকা নিয়ে দাও না, আমি কিনে দেবো।

হাসিনা বললো, আচ্ছা।

তসলিম গিয়ে ছাতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলো। হাসিনা চাপা-গলায় চিৎকার করে উঠলো, ওখানে দাঁড়াবেন না, ভেঙে পড়বে। এ-পাশটায় আসুন।

কার্নিশের পাশে এসে বসলো ওরা। ক্যামেরাটা খুলে, কী করে আকাশের ছবি নিতে হয় ওকে দেখালো তসলিম। আরো কাছে সরে এসে ওর কাঁধের ওপর একখানা হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে দেখছিলো হাসিনা। লেন্সের মধ্যদিয়ে সে দেখতে পেলো আকাশটা আবার মেঘে ছেয়ে আসছে। বাতাসে বিক্ষিপ্তভাবে ছুটছে তারা।

ক্যামেরাটা বন্ধ করে তসলিম বললো, বৃষ্টি আসতে পারে আবার, নিচে চলো।

কাঁধে রাখা হাতটায় একটা জোরে চাপ দিয়ে হাসিনা বললো, উঁহু, এখন আসবে না।

তসলিম বললো, বাজি ধরো, ঠিক আসবে।

আসুক, আমি এখন উঠবো না।

কেন ?

আমার বসে থাকতে ভালো লাগছে।

তসলিম মুখ ফিরিয়ে তাকালো ওর দিকে। হাসিনা ফিক করে হাসলো একটু। তারপর আঁচল দিয়ে ঠোঁটজোড়া চেপে সে বসে রইলো চুপচাপ। বৃষ্টি এলো না। সন্ধ্যা নেমে এলো।

রাতের অন্ধকার বাইরের পৃথিবী থেকে আড়াল করে দিয়ে গেলো ওদের। তসলিম বললো, 'রাত হয়ে গেছে, নিচে চলো।

উঁহু। কাঁধের ওপর থেকে হাতটা নামিয়ে নিলো হাসিনা। অন্ধকারে একজোড়া কটাকটা চোখের দিকে নীরবে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে অকস্মাৎ দু-হাতে ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিলো তসলিম। হাসিনা কোনো বাধা দিলো না। শুধু অস্ফুটস্বরে কী যেন বললো, শোনা গেল না।

হাসিনা-আ। নিচে থেকে মায়ের গলা ভেসে এলো। একবার। দু-বার। তিনবার।

অপূর্ব শিহরনে দুজনে কাঁপছিলো ওরা। বাহুবন্ধন শিথিল হয়ে এলো ধীরেধীরে। ছুটে ছাত থেকে নেমে এলো হাসিনা।

মা, মাগো, ওমা দৌড়ে এসে সালেহা বিবিকে জড়িয়ে ধরলো সে, মা, আমায় ডেকেছো মা ?

ওকি, অমন করছিস কেন ?

জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিলো হাসিনা। চোখেমুখে আনন্দের আবির ছড়ানো। মাকে ছেড়ে দিয়ে— দুলু বসেছিলো মেঝেতে— তাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগলো হাসিনা—দুলু, দুলু-উ উ। তোমার পুতুলগুলো কোথায়। চলো, দুজনে খেলবো আমরা।

কী খেলবে তুমি, পুতুল, পুতুল ?

না, তোমার পুতুলের সঙ্গে আমার পুতুলের বিয়ে দেবো আজ।

দুলু খুশি হলো, আপা আজ তার সঙ্গে পুতুল খেলবে।

কিন্তু খানিকক্ষণ পুতুল নিয়ে বসে আপার আর মন বসলো না। ছুটে সে রান্নাঘরে মায়ের কাছে চলে এলো— মা, আজ কী পাক করছো মা ?

সালেহা বিবি, তরকারিতে খানিকটা লবণ ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, নতুন কিছু না, রোজ যা রান্না হয়, তাই।

মা, আমি রাঁধবো, তুমি ঘরে যাও।

তরকারির কড়াই থেকে চোখ তুলে মেয়ের দিকে তাকালেন সালেহা বিবি। রান্নাঘরের ধার যে ঘেঁষে না, তার আজ হঠাৎ পাক করার শখ হলো কেন ? থাক, তোমাকে রাঁধতে হবে না, লেখাপড়া করো গিয়ে, যাও।

মা আমি তোমার পাশে বসবো মা। মায়ের পাশে এসে বসে পড়লো হাসিনা। খানিকক্ষণ পর আবার উসখুস করে উঠে গেলো সেখান থেকে। নিজের ঘরে এসে, টেবিলের ওপর থেকে আয়নাটা তুলে নিয়ে বসলো সে। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানাভাবে নিজেকে দেখলো হাসিনা। হেসে দেখলো। মুখখানা গম্ভীর করে দেখলো। কপট রাগ করে, ঠোঁটজোড়া বাঁকিয়ে কারো সঙ্গে যেন কথা বললো সে।

হ্যারিকেনের আলোয় বসে বই-এর ওপর চোখ বুলোচ্ছিলো মাহমুদ। ভাইয়া কী করছো ? ওর সামনে এসে ঝুঁকে পড়ে কী পড়ছে সে, দেখলো হাসিনা, ভাইয়া, তুমি একটা বিয়ে করো ভাইয়া, আমাদের বুঝি ভাবী দেখতে ইচ্ছে করে না।

কী ব্যাপার, আমার বউ দেখবার জন্যে হঠাৎ তোমার মন কেঁদে উঠলো কেন ? বইয়ের পাতার ওপর চোখ রেখে জবাব দিলো মাহমুদ— যাও নিজের বিয়ের কথা চিন্তা করো গিয়ে।

হাসিনার মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে গেলো। ধ্যাৎ, আমি বিয়ে করবো না' বলে সেখান থেকে পালিয়ে এলো হাসিনা। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পা-জোড়া উপরের দিকে তুলে দোলনার মতো দোলালো সে। তারপর বালিশে মুখ গুঁজে চোখ বুজলো। মিটিমিটি হাসলো। চোখের পাতায় একটি মুখ ভাসছে বারবার, আর একটি ছবি। বালিশটাকে দু-হাতে আঁকড়ে ধরলো হাসিনা।

সারারাত একটানা বৃষ্টি হলো।

সকালেও।

অপরাহ্নে, তখনো গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি ঝরছিলো বাইরে।

হাসমত আলী অফিসে গেছেন, মাহমুদ তার প্রেসে। বৃষ্টির জন্যে, হাসিনা আর খোকন স্কুলে যায়নি আজ। সালেহা বিবি ভরে-যাওয়া মাটির পাত্রগুলো থেকে পানি ফেলে দিয়ে আবার বসিয়ে দিচ্ছেন পুরানো জায়গায়।

টপটপ পানি পড়ছে ফাটলগুলো থেকে চুঁইয়ে। মাঝেমাঝে সুড়কির গুঁড়ো, ইটের কণা।

দুয়ারে কড়ানাড়ার মৃদু শব্দ হতে, দরজা খুলে দিয়ে চিৎকার করে উঠলো হাসিনা— মা মাগো, কে আসছে দেখে যাও, মা।

একটা চামড়ার সুটকেস হাতে দাঁড়িয়েছিলো মরিয়ম। জড়িয়ে ধরে তাকে ভেতরে নিয়ে এলো হাসিনা। দুলু ছুটে এসে আঁচল ধরে দাঁড়ালো তার।

মা ডেকে শুধালেন— কে এসেছে রে হাসি?

হাসিনা জবাব দিলো, আপা এসেছে। সুটকেসটা ওর হাত থেকে নিয়ে নিলো হাসিনা।

মরিয়ম দুলুকে কোলে তুলে আদর করলো।

দাদার ঘরে উঁকি মেরে মাহমুদ আছে কিনা দেখলো মরিয়ম।

হাসিনা বললো, সেই ভোরে বেরিয়ে গেছে।

মায়ের খাটের ওপর এসে বসলো মরিয়ম। চারপাশে তাকিয়ে বললো, ইস, ভীষণ পানি পড়ছে তো?

কিরে তুই একা এলি, জামাই আসেনি? কুয়োতলা থেকে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এসে বললেন সালেহা বিবি। জামাই এলো না কেন?

মরিয়ম ম্লান হয়ে বললো, কাজের ভীষণ চাপ।

খোকন বললো, আমার জন্যে টফি আনিসনি আপা।

এনেছি। আশপাশ তাকিয়ে সুটকেসটা খোঁজ করলো মরিয়ম। হাসিনা বললো, ওটা ও-ঘরে রেখে এসেছি, নিয়ে আসি।

সুটকেস নিয়ে এলে, খুলে দুটো টিন বের করলো মরিয়ম। বিস্কিট আর টফি। বিস্কিটের টিনটা মায়ের হাতে দিয়ে সে বললো, এটা রেখে দাও মা। নাস্তার সময় দিও।

মায়ের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মেয়ের পাশে এসে বসলেন তিনি।

টফির টিনটা খুলে খোকন আর দুলুকে কয়েকটা টফি দিলো মরিয়ম। হাসিনাকেও দিলো। সালেহা বিবির হাতে একমুঠো টফি গুঁজে দিতে তিনি হেসে বললেন, 'আমায় কেন?'

হাসিনা বললো, মাকে মিছিমিছি দিচ্ছিস আপা। মা কি খাবে? এই রাক্ষস দুটোর পেটে যাবে সব। বলে তর্জনী দিয়ে দুলু আর খোকনকে দেখালো হাসিনা।

খোকন জিভ বের করে ভেংচি কাটলো।

ওকে অনুসরণ করে দুলুও জিভ বের করলো হাসিনাকে উদ্দেশ্য করে। হাসিনা দাঁতমুখ খিচে বললো, আবার বের কর না, একেবারে কেটে দেবো।

একটা টফি কাগজ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মুখে দিলেন সালেহা বিবি। বারকয়েক চুষে বললেন, বেশ মিষ্টিতো। তুই খাচ্ছিস না কেন, একটা খা-না।

মরিয়ম সুটকেসের ডালাটা বন্ধ করলো ধীরেধীরে। মায়ের অনুরোধ কানে গেলো না ওর।

মুঠোয় ধরে-রাখা টফিগুলো আঁচলে বেঁধে রাখলেন সালেহা বিবি। হাসমত আলীকে আজ খাওয়াবেন একটা আর মাহমুদকে।

এতক্ষণ ইতিউতি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ভালো করে নজরে পড়েনি সালেহা বিবির, এবারে মেয়ের দিকে সন্ধানী-দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন, হ্যারে মরিয়ম, তুই অমন শুকিয়ে গেছিস কেন, অসুখ করেছিলো নাকি?

এই ভয়টাই এতক্ষণ করছিল মরিয়ম। মায়ের চোখে কিছু এড়াবে না তা জানতো সে। গত একমাসে শরীরটা অনেক খারাপ হয়ে গেছে, সেটা নিজেও বুঝতে পারে মরিয়ম। দিনেরাতে অবিচ্ছিন্ন চিন্তার স্রোতে ডুবে থাকলে, আঘাতে আর যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে শরীর ভালো থাকার কথা নয়।

ওকে চুপ থাকতে দেখে মা আবার বললেন, কী হয়েছিলো?

হাসিনা বললো, তাইতো! তোকে বড্ড রোগা লাগছে আপা।

মরিয়ম পরক্ষণে একটা মিথ্যে কথা বললো, ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছিলো।

ওর মুখখানা কোলে নিয়ে মা বললেন, বেশ মেয়েতো, অসুখ করেছিলো আমাদের একটু খবর দিতে পারলি না? আমরা কি পর হয়ে গেছি তোর?

হাসিনা বললো, খবর পাঠালে আমি দেখতে যেতাম।

চোখ ফেটে কান্না আসছিল মরিয়মের। একটু কাঁদতে পারলে বোধ হয় শান্তি পেতো সে। কিন্তু কেঁদে সকলকে বিব্রত করতে চায় না মরিয়ম। মায়ের কোল থেকে মাথা তুলে সে বললো, কাপড়টা বদলে নিই মা।

সাঁঝরাতে আকাশ ফরসা হয়ে তারা দেখা দিলো। একটা মেঘও আকাশে নেই এখন।

সালেহা বিবি বললেন, তারা উঠলে কী হবে, এ-সময় আকাশকে একটুও বিশ্বাস নেই, দেখবে আবার ঝুপঝুপ করে নেমে আসবে একটু পরে। হাসমত আলী বললেন, বাড়িওয়ালার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। দু-একদিনের মধ্যে মিস্ত্রি পাঠাবে।

দু-একদিনের কথা বলেছে তো, দেখবে দশদিন লাগবে। স্বামীর কথার ওপর মন্তব্য করলেন সালেহা বিবি। বলে মরিয়মের দিকে তাকালেন তিনি। সবার চোখ এ মুহূর্তে তার ওপর গিয়ে পড়েছে। কারণ মনসুর বলেছিলো— একটা ভালো বাসা দেখে ওদের নিয়ে যাবে। ম্লানমুখে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো মরিয়ম। বাবা কিংবা মায়ের দিকে তাকাতে ভয় হলো ওর। যদি তারা সে ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করে? তাহলে এখন কোনো জবাব দিতে পারবে না সে। মনসুর যে অনেক বদলে গেছে সে খবর তো কারো জানা নেই।

একটু পরে সেখান থেকে উঠে হাসিনার কামরায় চলে এলো মরিয়ম। হ্যারে হাসি, তসলিম এসেছিলো, না চলে গেছে?

কী একটা কাগজ নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো হাসিনা। ও আসতে কাগজ লুকিয়ে ফেলে সে বললো, হ্যাঁ, চলে গেছে।

ওটা কিরে ?

না কিছু না। মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে বই নিয়ে বসলো হাসিনা। ভাইয়ার সঙ্গে দেখা করোনি ? উনি এসেছেন তো।

তাই নাকি ! আঁচলটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে আবার বেরিয়ে এলো মরিয়ম।

বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে, পায়ের ওপর পা তুলে নিঃশব্দে সিগারেট টানছিল মাহমুদ। ভাইয়া কেমন আছো ? মরিয়ম এসে বসলো মেঝের উপর।

মরিয়ম যে। পা-জোড়া নামিয়ে নিলো মাহমুদ—বাবার বাড়ি সফর করতে এসেছো বুঝি ?

মরিয়ম মৃদু গলায় বললো, 'তুমিতো একটা দিনও গেলে না।'

বারকয়েক ঘনঘন সিগারেটে টান দিলো মাহমুদ। তারপর ছাই ফেলে বললো, তুমি জানতে আমি যাবো না, তবু মিছে অভিমান করছো। ভাবছো আমি বড় নির্দয়। সত্যি আমি তাই। কারো জন্যে আমার কোনো অনুভূতি নেই। বাবা, মা, ভাই, বোন— এই-যে কতগুলো শব্দের সৃষ্টি করেছো তোমরা, একটা অর্থহীন সম্পর্ক ছাড়া এর কোনো মূল্য আছে ? অন্তত আমার কাছে নেই। সিগারেটে একটা জোর টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো মাহমুদ। তারপর আবার বললো, আমিতো দুটি সম্পর্ক ছাড়া এর কোনো কিছুর অস্তিত্বই দেখি না। ওই বড়লোকের বাচ্চাগুলো যারা মুরগির মতো টাকার ওপর বসে বসে তা দিচ্ছে, আর আমরা গরিবের বাচ্চারা যাদের ওরা ছোটলোক বলে। এই দুটো সত্য ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না আমার। তুমি হয়তো মনে বড় আঘাত পাচ্ছো, কিন্তু কী আর বলবো বলো, ওরা হলো আমাদের মা-বাপ। আর আমরা ওদের ছা-পোষা জীব। থাকগে কেমন আছো বলো— সিগারেটের গোড়াটা ছুড়ে ফেলে দিলো মাহমুদ।

মরিয়ম আঙুল দিয়ে মেঝেতে দাগ কাটতে কাটতে বললো, ভালো।

ভালো যে থাকবে তা জানতাম। ছাতের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো মাহমুদ— তোমার মতো কপাল কটি মেয়ে পেয়ে থাকে। বাড়ি-গাড়ি-অর্থ সবই পেয়েছো তুমি। আর আমাদের অবস্থাটা একবার দেখো, সারাদিন খেটে এসে এমন খাদের মধ্যে শুয়ে আছি। টপটপ করে ঘরের মধ্যে বৃষ্টি পড়ছে, এটা নিশ্চয়ই আরামদায়ক নয়, কী বলো ? মরিয়মকে কোনো কথা না বলতে দেখে মাহমুদ আবার বললো, মাঝেমাঝে কী মনে হয় জানো, পুরুষ হয়ে না জন্মে যদি তোমার মতো সুন্দরী মেয়ে হয়ে জন্মাতাম তাহলে বেশ হতো। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো মাহমুদ। মরিয়ম তবু কোনো কথা বলছে না দেখে সে আবার বললো, হ্যাঁ, তোমাই সেই বান্ধবীটির কী খবর বলো তো ? মরিয়ম মুখ তুলে তাকালো— কার কথা বলছো ?

মাহমুদ বললো, সেই-যে কী নাম যেন—যাকগে বাদ দাও তার কথা। ওসব জেনে আমার কোনো কাজ নেই। পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বিড়ি আছে কিনা খুঁজে দেখলো সে।

সালেহা বিবি এসে খাবার জন্যে ডেকে গেলেন সকলকে। ও-ঘর থেকে হাসিনার গলা শোনা গেলো— আপা খাবি চল্।

মরিয়ম উঠে পড়লো, ভাইয়া খাবে না ?

যাও আসছি— মাহমুদ উঠে বসলো।

রান্নাঘরটা ভিজে থাকায় শোবার ঘরে খাটের পাশে একটা মাদুর বিছিয়ে খাওয়ার আয়োজন করেছেন সালেহা বিবি। অনেকদিন পরে একসঙ্গে খেতে বসলো ওরা। দুলুকে নিয়ে হাসমত আলী বসলেন সবার ডানদিকটায়। তাঁর পাশে বসলো মাহমুদ। তারপর হাসিনা আর মরিয়ম। একেবারে বাঁ পাশটায় খোকন। সালেহা বিবি বসলেন সবার দিকে মুখ করে মাঝখানটায়। নিজে খাবেন এবং সকলকে পরিবেশন করবেন তিনি। অনেকদিন পর একসঙ্গে খেতে বসে আনন্দের আভা জেগে উঠলো সবার চোখেমুখে। সালেহা বিবি সবচেয়ে খুশি। ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে বসিয়ে খাওয়ানোর তৃপ্তি ও আনন্দ যে কী পরিমাণ সেটা শুধু মা-ই জানেন। তাদের খাওয়ার মাঝখানে আবার আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামলো। বাইরে তাকিয়ে হাতটা ধুয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন সালেহা বিবি।

হাসিনা বললো, কোথায় যাচ্ছো মা ?

সালেহা বিবি বললেন, আবার বৃষ্টি এলো, মাটির ভাণ্ডগুলো জায়গামতো আছে কিনা দেখে আসি, নইলে সব ভিজে যাবে।

মরিয়ম বললো, খেয়ে নাও মা, এইতো বৃষ্টি এলো, অত তাড়াতাড়ি ভিজবে না।

মাহমুদ বললো, ভিজলে ভিজুক, তোমাকে আবার খাওয়ার মাঝখানে উঠতে বললো কে ?

আবার বসে পড়লেন সালেহা বিবি। কিন্তু বসেও স্বস্তি পেলেন না তিনি, বারবার উপরের দিকে তাকাতে লাগলেন। কোথায় পানি পড়ছে কে জানে। এক-মুখ ভাত চিবোতে চিবোতে মাহমুদ বললো, বাবার সেই পুরানো ছাতাটা আছে তো ঘরে ?

সালেহা বিবি জবাব দিলেন, আছে, কেন ?

আমায় প্রেসে যেতে হবে ?

এই বৃষ্টির মধ্যে ?

হ্যাঁ। আজ রাতে অনেকগুলো প্রুফ দেখতে হবে আমায়, সব জমা হয়ে আছে।

সকলে একবার করে তাকালো মাহমুদের দিকে। তারপর নীরবে খেতে লাগলো।

অনেকদিন পর নিজের সেই পুরানো বিছানাটায় শুয়ে আজ কেমন নতুন ঠেকছিলো মরিয়মের। হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে চুপচাপ উদ্দাম বৃষ্টির রিমঝিম গান শুনছিলো আর ভাবছিলো মনসুরের কথা। লিলি বলে, সে ভুল করেছে। হয়তো তাই। সবকিছু ওকে খুলে না বললেও, হতো। তাহলে মনসুর নিশ্চয় এমন ব্যবহার করতো না তার সাথে। যেমন চলছিলো সবকিছু, তেমন চলতো। হাসি আর আনন্দের অফুরন্ত স্রোতে ভাসতো ওরা দুজনে। কিন্তু সত্যকে ঢেকে রাখার কী অর্থ হতে পারে। মরিয়ম জাহেদকে ভালবেসেছিলো। হ্যাঁ, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে, সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে আপনার করে নিতে চেয়েছে। দুটোই সত্য। মরিয়ম বুঝতে পারে না এ সত্যের সহজ স্বীকৃতিতে ভুল কোথায়। সেকি মিথ্যার মুখোশ পরলে মনসুর সন্তুষ্ট হতো ? দুবার কি মানুষ প্রেমে পড়তে পারে না ? মনসুর কেন এমন হয়ে গেলো ? হাসিভরা জীবনের মাঝখানে অশ্রু কেন এলো ? ভাবতে গিয়ে দুচোখ সজল হয়ে এলো মরিয়মের।

ফাটল বেয়ে টপটপ পানি ঝরে পড়ছে নিচে। সেদিকে চেয়ে-চেয়ে একসময় সে মনে মনে ঠিক করলো ফিরে গিয়ে মনসুরকে তার এই যন্ত্রণার কথা খুলে বলবে মরিয়ম।

করজোড়ে তার কাছে পুরানো দিনগুলো আবার ভিক্ষে চাইবে। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লো সে। জানালা গলিয়ে আসা বাতাসে চুলগুলো উড়ছে ওর। এতক্ষণে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।

মেঝেতে বিছানো মাদুরটার ওপর বালিশটা বুকের নিচে দিয়ে উপুড় হয়ে পা-জোড়া ছড়িয়ে দিয়েছে হাসিনা দরজার দিকে। সামনে একটা সাদা কাগজ আর কলম। হ্যারিকেনের আলোটা আরেকটু বাড়িয়ে দিয়ে সতর্কদৃষ্টিতে, অদূরে চৌকির ওপরে শোয়া মরিয়মের দিকে তাকিয়ে ধীরেধীরে ব্লাউজের ভেতর থেকে একটা চিঠি বের করলো হাসিনা। তসলিমের চিঠি। বিকেল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত তিন-চারবার চিঠিখানা আগাগোড়া পড়েছে। তবু উত্তর দেবার আগে আরেকবার পড়ে নিলো সে। তারপর অতি যত্ন-সহকারে গোটাগোটা করে লিখলো হাসিনা—প্রিয় লিখেই কেটে দিলো। কী সম্বোধন করা যেতে পারে? সে লিখেছে 'হাসি' সম্বোধন করে। বারকয়েক কাটাছেঁড়ার পর হাসিনা লিখলো—

তসলিম,

তুমি আমাকে অনেক অনেক ভালোবাসো, আর আমাকে ছাড়া বাঁচবে না লিখেছো। আমারও তাই মনে হয়। সেদিন বিকেল থেকে কিছু ভালো লাগছে না আমার। তোমাকে সবসময় দেখতে ইচ্ছে করে। আমার হাতের লেখা ভীষণ খারাপ। আর তোমার মতো গুছিয়ে আমি লিখতে পারি না। বাবা-মা কেউ এ ব্যাপারটা জানে না। সত্যি তোমার জন্য মনটা আমার সবসময় খারাপ হয়ে থাকে। তুমি আমাকে ভালোবাসো, কিন্তু আমি দেখতে ভীষণ বিশ্রী। তুমি কত সুন্দর।

এখানে এসে চোখজোড়া ঘুমে জড়িয়ে আসছিলো হাসিনার। অসমাপ্ত চিঠিটা খাতার মধ্যে লুকিয়ে সেটা বালিশের তলায় রেখে দিলো সে। হ্যারিকেনটা নিভিয়ে দিয়ে সেখানেই শুয়ে পড়লো। ধীরেধীরে ঘুমের সমুদ্রে তলিয়ে গেলো হাসিনা। ঠোঁটের কোণে শুধু ছড়িয়ে রইলো একটুকরো প্রশান্ত হাসি।

এ-ঘরে বাতি নিভে গেলেও ও-ঘরে আলো জ্বলছিলো। হাসমত আলী আর সালেহা বিবি তখনো জেগে। টিমটিমে হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে পুরো বাড়িটা একবার ঘুরে গেলেন সালেহা বিবি। নতুন কোথাও পানি পড়ছে কিনা। সদর দরজাটা বন্ধ, না খোলা— দেখে গেলেন। হাসিনার গায়ের কাপড়টা উঠে গিয়েছিলো, উপুড় হয়ে সেটা নামিয়ে দিলেন তিনি। তারপর নিজের কামরায় ফিরে এসে হ্যারিকেনটা রাখলেন মেঝের উপর। ওরা কি ঘুমিয়ে পড়েছে? শোবার আয়োজন করতে করতে শুধোলেন হাসমত আলী।

হ্যাঁ। কুয়োতলার দিকটার দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে খাটের ওপর এসে বসলেন সালেহা বিবি।

বাইরে বৃষ্টি ঝরছে রিমঝিম। একটানা বর্ষণ। মাঝেমাঝে দমকা বাতাস দেয়ালের গায়ে লেগে করুণ বিলাপে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। পৃথিবীর চোখে অশ্রু ঝরছে, বিষণ্ন ব্যথার চাপে।

বাতি নিভিয়ে দাও। শুয়ে পড়ে বললেন, হাসমত আলী।

হ্যারিকেনটা নিভিয়ে দিতে অন্ধকার গ্রাস করে নিলো ঘরটা। কোথায় একটা টিকটিকি ডেকে উঠলো, টিকটিক শব্দে। দু-হাতে নিজের জায়গাটা হাতড়ে নিয়ে কাত হলেন

সালেহা বিবি। মাঝখানে দুলু আর খোকন। দু-পাশে ওঁরা দু-জন, হাসমত আলী আর সালেহা বিবি।

খানিকক্ষণ পর সালেহা বিবি ডাকলেন, শুনছো ?

উঁ। সাড়া দিলেন হাসমত আলী।

ঘুমোচ্ছে নাকি ?

না।

কাল মরিয়মকে ও ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করবো ?

কোন্‌টা ?

মনসুর যে বলেছিলো একটা নতুন বাসায় নিয়ে যাবে আমাদের।

মাহমুদের সঙ্গে আলোচনা কোরো।

বাইরে বৃষ্টির উদ্দাম নৃত্য চলছে। ভেতরে টপটপ বৃষ্টি পড়ছে ফাটলগুলো বেয়ে। মাঝেমাঝে ভেজা সুরকির গুঁড়ো।

শুনছো ? আবার সালেহা বিবির গলা।

কী ?

এ বাড়িতে থাকা আর ঠিক হবে না। আমার ভীষণ ভয় করে। হাসমত আলীর কাছ থেকে এবার উত্তর পেলেন না সালেহা বিবি। মৃদু নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে তাঁর। একটু পরে তিনিও তন্দ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

এখন সকলে গভীর ঘুমে অচেতন।

তখনো বৃষ্টি থামেনি। ইলশেগুঁড়ির মতো ঝরছে।

প্রেসের কাজ শেষ করে, দু-চোখে ঘুম নিয়ে, ভোর হবার কিছু আগে বাসার পথে ফিরে এলো মাহমুদ।

গলির মাথায় তিন-চারখানা ফায়ারব্রিগেডের লাল গাড়ি দাঁড়ানো। গলির ভিতরে, আবছা অন্ধকারে লোকজন ভিড় করে আছে। ওকে দেখে চিনতে পেরে, অনেকে অবাক চোখে তাকালো। দু-একজন এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলো, আপনি কি বাইরে ছিলেন নাকি ?

কোথায় ছিলেন আপনি ?

কোত্থেকে আসছেন ?

ছেলে-বুড়োরা ওকে ঘিরে দাঁড়ালো। দু-পাশের জীর্ণ দালানের ভাঙা জানালাগুলো দিয়ে বাড়ির ঝি-বউ উঁকি মেরে দেখল ওকে।

প্রশ্নকর্তাদের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকালো মাহমুদ। গলিতে এত ভিড় কেন, ফায়ার ব্রিগেডের লোকগুলোই বা এত ছুটোছুটি করছে কেন ?

আহা বেচারা ! কে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। জানালার ওপাশ থেকে।

কেউ কি বেঁচে নেই ?

বোধ হয় না।

সমস্ত দেহটা অজানা শঙ্কায় শিরশির করে উঠলো মাহমুদের। মনে হলো হাত-পা গুলো সব ভেঙে আসছে তার। দাঁড়িয়ে থাকার শক্তিও পাচ্ছে না সে। তবু দু-হাতে ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে গেল মাহমুদ। সকলে নীরবে পথ ছেড়ে দিলো তাকে। সবাই ভেবেছিলো, বাসার সামনে একটা তীব্র আর্তনাদে ফেটে পড়বে সে। কিন্তু সে আর্তনাদ করলো না, থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। সামনের ভগ্নস্তূপটার দিকে নিশ্চল দৃষ্টিতে তাকিয়ে

রইলো মাহমুদ। বাতি হাতে ফায়ারব্রিগেডের লোক ছুটোছুটি করছে। উদ্ধারের কাজ চালোচ্ছে ওরা। পেছনের বাড়িতে সরু বারান্দাটার ওপর থপ করে বসে পড়লো মাহমুদ। মনে হলো এ মুহূর্তে অনুভূতিগুলো তার মরে গেছে। সে যেন এক শূন্যতায় ডুবে গিয়ে, ফাঁপা বেলুনের মতো বাতাসে দুলছে। না, মাথাটা ঘুরছে ওর। দেহটা টলছে। কিন্তু হৃদয়ে কোনো জ্বালা নেই।

ধীরে ধীরে ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

মাহমুদ তেমনি বসে।

একটা কথাও এতক্ষণে বলেনি সে। কী বলবে ?

পাড়ার লোকেরা আলাপ করছিলো নিজেদের মধ্যে। মাঝরাতে একটা ভয়ংকর শব্দে জেগে উঠে হকচকিয়ে গিয়েছিলো সকলে। এমন ভয়াবহ শব্দ কোথা থেকে এলো ? পরে তারা একে-একে দেখতে পেলো হাসমত আলীর বাড়িটা ধসে পড়েছে। ঘর ছেড়ে সকলে ছুটে বেরিয়ে এলো। কিন্তু অন্ধকারে ভাঙা ইটের স্তূপ ছাড়া আর কিছু নজরে এলো না কারো।

ইটের স্তূপ সরিয়ে, একটা মৃতদেহ বের করে, স্ট্রেচারে তুলে এনে ওর সামনে মুহূর্ত কয়েকের জন্য দাঁড়ালো ফায়ারব্রিগেডের চারজন লোক। একনজর তাকিয়ে, দাঁতে দাঁত চেপে চোখজোড়া অন্য দিকে সরিয়ে নিলো মাহমুদ। মাথাটা থেঁতলে গেছে মরিয়মের। কী কদাকার লাগছে এখন তাকে। মারা গেছে সে। কেন মরলো ? কেনই বা সে গতকাল আসতে গিয়েছিলো এখানে। না এলে সে নিশ্চয় মরতো না। ওদের বাড়ি নিশ্চয় ধসে পড়বে না এভাবে। তাহলে, মৃত্যুই কি তাকে টেনে এনেছিলো এখানে ? হাসিনার মৃতদেহটা আবিষ্কৃত হলো একটু পরে। গলাটা ভেঙে গেছে তার। ঝুলে আছে দেহ থেকে ; মাহমুদের মনে হলো ওর ঠোঁটের কোণে একটুকরো হাসি লেগে আছে। মেয়েটা কি হাসতে হাসতে মারা গেছে ? এ বয়সে যদি মারা যেতে হলো তবে জন্মেছিলো কেন ? আর এখন সে কোথায় আছে ? মৃত্যুর পর কোথায় যায় মানুষ ? কাল তাদের সকলকে দেখেছে মাহমুদ। হাসছিলো। কথা বলছিলো। হেঁটে বেড়াচ্ছিলো এ-ঘর থেকে সে-ঘরে। এখন তারা কোথায় ? তাদের দেহগুলো এখনো দেখতে পাচ্ছে সে। কিন্তু তারা নেই। কেন এমন হলো! চারপাশে লোকজনের কোলাহল বেড়েছে এখন।

মানুষের ভিড়। ছেলে-বুড়ো, জোয়ান-মরদ গিজগিজ করছে এসে। মাহমুদ উদাস দৃষ্টি মেলে তাকালো সবার দিকে। খবর পেয়ে থানা থেকে একদল পুলিশও এসেছে।

দুলুর মৃতদেহটা স্ট্রেচারে করে সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। মাথার মগজগুলো সব বেরিয়ে গেছে ওর। সারা দেহ রক্তে চবচব করছে।

আহা, বাচ্চাটা—। কে যেন আফসোস করছিলো।

বাচ্চা নয়, কুত্তার বাচ্চা। নইলে অমন করে মরতে হলো কেন ? দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করে উঠলো মাহমুদ। পরক্ষণে ওর মনে হলো, তাইতো সেও মারা যেতে পারতো। রাতে বাসায় থাকলে সেও মরতো আর অমনি স্ট্রেচারে করে মৃতদেহটা নিয়ে যাওয়া হতো তার। তারপর কবর দেয়া হতো আজিমপুর গোরস্থানে। তারপর কী হতো ? কোথায় থাকতো, কোথায় যেতো মাহমুদ ? ভাবতে গিয়ে তার মনে হলো দেহের লোমগুলো সব খাড়া হয়ে গেছে, ঘাম দিচ্ছে সারা গায়ে।

হাসমত আলী সাহেবের বড় ছেলে আপনি, তাই না ? সামনে একজন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে।

কেন, কী চাই আপনার ? অদ্ভুত গলায় জবাব দিলো মাহমুদ।

যারা মারা গেছেন তাঁদের সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে একটা রিপোর্ট নিতে হবে।

কী করবেন রিপোর্ট নিয়ে ? হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো মাহমুদ— পারবেন ওই—ওই বড়লোকের বাচ্চাগুলোকে শূলে চড়াতে ? কী করবেন আপনারা রিপোর্ট নিয়ে ?

পুলিশ অফিসার হকচকিয়ে গেলেন।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বললো, পুলিশ লাইনের লোকগুলোর মাথায় কি গোবর পোরা থাকে নাকি মশাই ? এ সময় তাকে জ্বালাতে গেছেন কেন ? আর সময় নেই ?

অল্প কটি কথা বলে রীতিমতো হাঁপাচ্ছিলো মাহমুদ। দু-হাতে কপালটা চেপে ধরে চুপচাপ বসে রইলো সে। সারাদেহ বেয়ে ঘাম ঝরছে তার।

বিকেলে আজিমপুর গোরস্থানে কবরস্থ করা হলো মৃতদেহগুলোকে। খবর পেয়ে মনুসর এসেছিলো। বোবা হয়ে গেছে সে। সবকিছু কেমন আকস্মিক অস্বাভাবিক মনে হলো তার।

এতক্ষণ মাহমুদের সঙ্গে একটা কথাও হয়নি। দু-জনে নির্বাক। গোরস্থান থেকে বেরিয়ে এসে কাঁপা গলায় বললো, কোথায় যাবেন এখন ভাইজান ?

মাহমুদ নীরবে পথ চলতে লাগলো।

পেছনে থেকে এসে ওর একখানা হাত ধরলো মনসুর। ঢোক গিলে বললো, আমার ওখানে চলুন ভাইজান।

এতক্ষণে ওর দিকে তাকালো মাহমুদ। একটা অর্থহীন দৃষ্টি তুলে দেখলো তাকে। তারপর ধীরেধীরে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে টলতে টলতে সামনে এগিয়ে গেলো সে। মনসুর কাতর গলায় বললো, আমাকে ভুল বুঝবেন না।

মাহমুদের কানে কথাটা এলো কিনা বোঝা গেল না। আগের মতো পথ চলতে লাগলো সে। পুরো সন্ধেটা পথে পথে ঘুরে কাটিয়ে দিলো মাহমুদ। সেও মরতে পারতো, কিন্তু বেঁচে গেছে, অদ্ভুতভাবে বেঁচে গেছে সে। কাল যারা ছিল আজ তারা নেই। নেই— এ কথা ভাবতে গিয়ে বিশ্বাস হলো না তার। মনে হলো তারা বেঁচে আছে। তাদের কথাবার্তা সব শুনতে পাচ্ছে সে। দেখতে পাচ্ছে তাদের। কিন্তু তারা নেই। এ জীবনে দ্বিতীয়বার আর সেই রক্তমাংসের দেহগুলোকে দেখতে পাবে না মাহমুদ। তারা গেছে চিরতরে, ছেড়ে গেছে এই পৃথিবীর মায়া। সারা দেহটা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে এলো। মাথার শিরাগুলো বুঝি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

বিশ্রামাগারের দোরগোড়ায় পা রাখতে, কেরোসিন কাঠের কাউন্টারের ওপাশ থেকে খোদাবক্স ঝুঁকে পড়ে তাকালো ওর দিকে।

খবরটা ইতিমধ্যে কানে এসেছে তার। কাউন্টার ছেড়ে বেরিয়ে এসে ওর পাশে দাঁড়ালো খোদাবক্স। আস্তে ওর পিঠের ওপর একখানা হাত রেখে মৃদু গলায় বললো, আমি সব শুনেছি মাহমুদ সাহেব। কী আর করবেন, সব খোদার ইচ্ছা।

মাহমুদ তার লাল টকটকে একজোড়া চোখ মেলে তাকালো ওর দিকে। তারপর অকস্মাৎ দু-হাতে ওর গলাটা টিপে ধরে চিৎকার করে উঠলো সে— সব খোদার ইচ্ছে, শালা জুচ্চুরির আর জায়গা পাওনি। গলাটা টিপে এখনি মেরে ফেলবো তোমায়, দেখি কোন্ খোদা বাঁচাতে আসে, শয়তানের বাচ্চা কোথাকার।

তীব্র আর্তনাদ করে ছিটকে সকলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

টলতে টলতে আবার বাইরে বেরিয়ে এলো মাহমুদ।

আরো অনেকক্ষণ রাস্তায় ঘুরে বেড়ালো সে।

মাঝরাতে প্রেসে এসে লম্বা বেঞ্চিটার ওপর শুয়ে পড়লো মাহমুদ।

ম্যানেজার তাকে দেখে কী যেন জিজ্ঞেস করলো। কিছু কানে গেলো না ওর। লাল চোখজোড়া মেলে একবার তাকিয়ে আবার চোখ মুদলো সে। ম্যানেজার উঠে এসে ঝুঁকে পড়ে দেখলো ওকে, তারপর গায়ে হাত লাগতে আঁতকে উঠলো।

পরপর চারটে দিন জ্বরে অচৈতন্য হয়ে রইলো মাহমুদ।

প্রলাপ বকলো।

ঘুমোল।

আবার প্রলাপ বকলো।

চতুর্থ দিনের মাথায় জ্ঞান ফিরে আসতে চোখ খুলে মাহমুদ দেখলো একটা পরিচিত মুখ ঝুঁকে পড়ে দেখছে তাকে। প্রথমে মনে হলো মরিয়ম। তারপর মনে হলো হাসিনা। অবশেষে ভালো করে তাকিয়ে দেখলো লিলি। লিলি দাঁড়িয়ে।

আমি কোথায় আছি এখন ? কাতর গলায় প্রশ্ন করলো মাহমুদ। সারা মুখে বিস্ময়। লিলি মাথার কাছ থেকে পাশে এসে বসলো তার। বললো, কেমন লাগছে এখন আপনার ?

আমার কী হয়েছে ? কোথায় আছি আমি ? মা, ওরা কোথায় ? একসঙ্গে তিনটি প্রশ্ন করলো মাহমুদ। বিস্ময়-ঘোর এখনো কাটেনি তার।

লিলি মুখখানা সরিয়ে নিলো অন্যদিকে।

ধীরেধীরে সবকিছু মনে পড়লো মাহমুদের। মা, বাবা, মরিয়ম, হাসিনা, দুলু, খোকন—একে-একে সবার কথা মনে পড়লো তার। মৃতদেহগুলো ভেসে উঠলো চোখের ওপর। তাইতো, তারা সকলে মারা গেছে। আজিমপুর গোরস্থানে কবর দেয়া হয়েছে তাদের। কেন এমন হলো ? কেন তারা মারা গেল ? সারা বুক যন্ত্রণায় ফেটে পড়তে চাইলো তার। বোবা দৃষ্টি মেলে অসহায়ভাবে সে তাকালো লিলির দিকে।

লিলি ঝুঁকে পড়ে আবার জিজ্ঞেস করলো, কেমন লাগছে এখন আপনার ? গত চারদিন ধরে অচৈতন্য হয়ে আছেন। মনসুর সাহেবসহ কত জায়গায় খুঁজেছি আপনাকে, শেষে প্রেসে গিয়ে দেখলাম জ্বরে বেহুঁশ হয়ে আছেন। এখন কেমন লাগছে আপনার ?

একে-একে বিশ্রামাগারে যাওয়া আর প্রেসে এসে বেঞ্চের ওপর শুয়ে পড়ার ছবিটা ভেসে উঠলো চোখে। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে মৃতদেহগুলো আবার দেখা দিলো চোখে। বুকটা শূন্যতায় হু-হু করে উঠলো। কান্না এলো তার। বেদনাজড়িত গলায় সে বললো, কেন এমন হলো বলতে পারেন, কেন এমন হলো ? আমার যে কেউ রইলো না, আর কেউ না, আমি কেমন করে বাঁচবো।

ধীরেধীরে মুখখানা ওর মাথার ওপর নামিয়ে আনলো লিলি। দু-চোখে অশ্রু ঝরছে তার। কান্নাভরা গলায় সে কানে কানে বললো, 'আমি আছি, আমি যে তোমার ওগো, বিশ্বাস করো। আমি আছি, ওগো একবার মুখখানা তুলে তাকাও আমার দিকে, একটিবার চেয়ে দেখো।

সকালের ডাকে–আসা চিঠিখানা বারকয়েক নেড়েচেড়ে দেখলো লিলি। আঁকাবাঁকা অক্ষরে মাহমুদের নাম আর ঠিকানা লেখা। অপরিচিত হস্তাক্ষর।

দুপুরে সে বাসায় এলে লিলি বললো, তোমার চিঠি এসেছে একখানা। টেবিলের ওপর রাখা আছে।

খামটা ছিঁড়ে চিঠিখানা পড়লো মাহমুদ।

শাহাদাত লিখেছে, ভৈরব থেকে।

মাহমুদ।

অনেকদিন তোমাদের কোনো খোঁজখবর পাইনি। জানি না কেমন আছো। আজ বড় বিপদে পড়ে চিঠি লিখছি তোমাকে। জানি এ বিপদ থেকে তুমি কেন, কেউ উদ্ধার করতে পারবে না আমায়। তবু মানসিক অশান্তির চরম মুহূর্তে নিজের দুঃখের কথা ব্যক্ত করার মতো তুমি ছাড়া আর কাউকে পেলাম না, তাই লিখছি।

আমেনার যক্ষ্মা হয়েছে।

ঢাকা থাকতেই রোগের প্রাথমিক লক্ষণগুলো দেখা দিয়েছিলো, এখন বোধহয় তার শেষ দিন ঘনিয়ে এলো।

তুমি হয়তো অবাক হয়ে ভাবছো, এতদিন পরে এ খবরটা তোমাকে জানাতে গেলাম কেন। আসলে আমিও এ ব্যাপারে প্রায় অজ্ঞ ছিলাম। আমাকে সে কিছুই জানতে দেয়নি। মাঝে মাঝে লক্ষ করতাম, একটানা অনেকক্ষণ ধরে খুকখুক করে কাশতো সে। বড় বেশি কাশতো। কখনো কখনো তার কাপড়ে রক্তের ছিটেফোঁটা দাগ দেখে প্রশ্ন করেছি। কিন্তু কোনো উত্তর পাইনি। আবার, একদিন রাতে অকস্মাৎ রক্তবমি করতে করতে মূর্ছা গেল সে।

ডাক্তার ডাকলাম। রোগী দেখে তিনি ভীষণ গালাগাল দিলেন আমায়। বললেন তক্ষুনি ঢাকায় নিয়ে যেতে।

একদিন ভাইদের অমতে সে বিয়ে করেছিলো আমায়। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলো মাথা উঁচিয়ে। সে–সব কথা তুমি জানো। ভাইদের কাছ থেকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিলো তাকে। আজ তাদের সামনে তিলতিল করে মরতে সে রাজি নয়। টাকা-পয়সার জন্যে হাত পাতবে— এ–কথা কল্পনাও করতে পারে না সে।

এদিকে আয় বড় কমে গেছে। দোকানের অবস্থা খুব ভালো নয়। লোকের হাতে টাকা নেই, চাহিদা থাকলেও জিনিসপত্র কিনবে কী দিয়ে ?

জীবনে কিছুই করতে পারলাম না মাহমুদ।

আমেনার জন্যেও যে এ–মুহূর্তে কিছু করতে পারবো, ভরসা হয় না। সারাটা জীবন ও শুধু আমাকে দিয়ে গেলো। ওকে আমি কিছু দিতে পারলাম না। দোয়া করো, ওর সঙ্গে সঙ্গে আমিও যেন কবরে যেতে পারি।

এ দুনিয়াতে এর চেয়ে বড় কোনো চাওয়া কিংবা পাওয়া আর নেই আমার। ছেলেমেয়েগুলোর জন্য মাঝেমাঝে ভাবনা হয়। খোদা দিয়েছেন, খোদাই ওদের চালিয়ে

নেবেন। এতক্ষণ শুধু নিজের কথা লিখলাম, কিছু মনে করো না। তোমার দিনকাল কেমন চলছে জানিও। লিলি কেমন আছে? মিতাকে আমার চুম্বন দিয়ো।

তোমার শাহাদাত।

চিঠিখানা একবার পড়ে শেষ করে আবার পড়লো মাহমুদ। তারপর চোয়ালে হাত রেখে অনেকক্ষণ বসে বসে অনেক কিছু ভাবলো সে। মিতাকে কোলে নিয়ে লিলি এসে দাঁড়ালো পাশে। মৃদু গলায় শুধালো, কার চিঠি ওটা?

মাহমুদ বললো, শাহাদাত লিখেছে।

লিলি জানতে চাইলো— ওরা ভালো তো?

মাহমুদ চিঠিখানা এগিয়ে দিলো ওর দিকে।

লিলির পড়া শেষ হলে মাহমুদ আস্তে আস্তে বললো, 'আমাকে এক্ষুনি আবার বেরুতে হচ্ছে লিলি!

এই অবেলায় কোথায় যাবে? লিলি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো।

মাহমুদ ধীর গলায় বললো, আমেনাকে এখানে নিয়ে আসার জন্যে একখানা টেলিগ্রাম করবো ভাবছি।

লিলির মুখখানা অকস্মাৎ ম্লান হয়ে গেলো। ইতস্তত করে সে বললো, এখানে আনবে?

মাহমুদ লক্ষ করলো লিলি ভয় পেয়েছে। একটা যক্ষ্মা রোগীকে বাসায় আনা হবে, বিশেষ করে, যে ঘরে একটি বাচ্চা মেয়ে রয়েছে সেখানে, ভাবতে আতঙ্ক বোধ করছে লিলি।

ওর খুব কাছে এগিয়ে এসে শান্ত গলায় মাহমুদ বললো, আমার যদি কোনো কঠিন অসুখ হয় তাহলে কি আমাকে তুমি দূরে সরিয়ে দিতে পারবে লিলি? তবে ওর জন্যে তুমি ভয় করছো কেন?

লিলি গম্ভীরকণ্ঠে জবাব দিলো, ওটা যা ছোঁয়াচে রোগ-না, ওকে এখানে আনতে পারবে না তুমি। মিতাকে বুকের মধ্যে দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরলো সে।

দেখো, তোমাদের এ স্বভাবটা আমার একেবারে পছন্দ হয় না—সহসা রেগে উঠলো মাহমুদ—সব সময় নিজেকে নিয়ে চিন্তা করো তোমরা।

লিলির চোখেমুখে কোনো ভাবান্তর হলো না। মিতাকে কোলে নিয়ে জানালার পাশে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো সে।

মাহমুদ নীরব।

পায়ের শব্দে লিলি ফিরে তাকিয়ে দেখলো, বাইরে বেরিয়ে গেলো মাহমুদ। রাস্তায় নেমে কাছের পোস্টাফিস থেকে শাহাদাতকে একখানা টেলিগ্রাম করে দিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে আবার ফিরে এলো মাহমুদ। এসে বিছানায় চুপচাপ শুয়ে পড়লো সে।

লিলি তখনও জানালায় পাশে দাঁড়িয়ে হাতের নখ খুঁটছে। মিতাকে সে একটু আগে শুইয়ে দিয়েছে তার দোলনায়।

ঈষৎ তন্দ্রায় চোখজোড়া জড়িয়ে আসছিলো মাহমুদের। লিলির ডাকে চোখ মেলে তাকালো সে।

লিলি কোমল কণ্ঠে ডাকলো, শুনছো ?

মাহমুদ আস্তে শুধালো, কি ?

আমি বলছিলাম কি টেলিগ্রাম করে কী হবে ওর কাছে এসে বসলো লিলি— তারচে, তুমি নিজে গিয়ে নিয়ে এসো ওকে।

লিলির কণ্ঠস্বরটা এখন সহানুভূতির সুরে ভরা।

মাহমুদ দু-হাতে ওকে কাছে টেনে নিয়ে মৃদু স্বরে বললো, আমি জানতাম লিলি, তুমি ওকে দূরে সরিয়ে দিতে পারবে না।

লিলি সলজ্জে হেসে ঘুমন্ত মিতার দিকে তাকালো একপলক, কিছু বললো না। কাল মিতার জন্মদিন। রাতে শুয়ে-শুয়ে অনেকক্ষণ সে ব্যাপারে আলোচনা করেছে ওরা। মাহমুদ বলেছে, বেশি লোককে ডাকা চলবে না, ওতে অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য ক্ষুণ্ন হয়।

ওর বাহুর ওপর মাথা রেখে লিলি শুধিয়েছে, তুমি কাকে কাকে বলতে চাও ?

মাহমুদ মৃদুস্বরে বলেছে, রফিককে বলবো আর বলবো নঈমকে।

আমি মনসুরকে বলে দিয়েছি, বউকে সঙ্গে নিয়ে সে আসবে। লিলি আস্তে করে বলেছে, তসলিমকেও খবর দিয়েছি।

মাহমুদ সংক্ষেপে বলেছে, ঠিক আছে।

তারপর ধীরেধীরে ঘুমিয়ে পড়েছে ওরা।

ভোরে উঠে হাতমুখ ধুয়ে চা-নাস্তা পরে মাহমুদ যখন বেরুতে যাবে তখন লিলি স্মরণ করিয়ে দিলো—যাদের বলার আছে এইবেলা বলে এসো। আর শোনো, ভৈরব কবে যাচ্ছো তুমি ?

যাওয়ার পথে থামলো মাহমুদ। থেমে বললো, দেখি কাল কিংবা পরশু যাবো। আমেনা যেমন মেয়ে, নিশ্চয় আসতে চাইবে না। টেলিগ্রামটা পেয়েছে কিনা কে জানে। কাটা-কাটা কথাগুলো বলে রাস্তায় নেমে এলো সে।

জিন্নাহ্ এভিন্যুতে নতুন অফিস করেছে রফিক। এখন আর অন্যের অধীনে কাজ করছে না, সে নিজস্ব কোম্পানি খুলেছে একটা। স্বাধীন ব্যবসা তার। বড় বড় কন্ট্রাক্ট পাচ্ছে আজকাল। রাস্তা মেরামত, বাড়িঘর তৈরী কিম্বা একজায়গা থেকে অন্য জায়গার ইট, চুন, সুরকি ও লোহা-লক্কড় সরবরাহের কন্ট্রাক্ট।

প্রেস হয়ে যখন রফিকের অফিসে পৌঁছলো মাহমুদ, তখন বেশ বেলা হয়েছে। বাইরের ঘরে কয়েকজন কর্মচারী নীরবে কাজ করছে। তাদের একপাশে নঈমকে দেখতে পেলো মাহমুদ। মস্ত বড় একটা খাতার উপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন হিসেব করছে সে। ওর দিকে চোখ পড়তে ইশারায় কাছে ডাকলো, মাহমুদ যে, কী মনে করে ?

মাহমুদ বললো, কাল মিতার জন্মদিন, তাই তোমাদের নেমন্তন্ন করতে এলাম। রফিক আছে কি ?

আছে। পর্দা ঝোলানো চেম্বারটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে নঈম বললো, একটু আগে এসেছে। যাও না, দেখা করো গিয়ে। এই শোনো—। হঠাৎ কী মনে হতে ওকে আবার ডাকলো নঈম— তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, ভীষণ সিরিয়াস কথা, বসো বলছি। মাহমুদ বসলো।

সামনে খোলা খাতাটা বন্ধ করে একপাশে ঠেলে রেখে দিলো নঈম। চারপাশে তাকিয়ে নিয়ে চাপা গলায় ধীরেধীরে বললো, রফিক একটা মেয়েকে ভালোবাসতো মনে আছে তোমার ?

হ্যাঁ মাহমুদ মাথা দুলিয়ে সায় দিলো।

সে মেয়েটা এখনো তাকে ভালোবাসে।

হুঁ।

আজ ক-দিন ধরে রফিক কী বলছে জানো ?

না।

বলেছে— বলতে গিয়ে বারকয়েক নড়েচড়ে বসলো। 'রফিক বলছে, মেয়েটাকে নাকি আমাকে বিয়ে করতে হবে।

সে কী ! মাহমুদ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো ওর দিকে। তুমি বিয়ে করতে যাবে কেন ?

দেখতো মজা। ঠোঁটের ফাঁকে মিটিমিটি হাসলো নঈম। এককালে ভালোবাসতো রফিক একথা ঠিক, এখন সে-সব কোথায় চলে গেছে। কিন্তু মেয়েটা ভীষণ হ্যাংলা, কিছুতে ওর পিছু ছাড়বে না। এখন হয়েছে কী— বলতে গিয়ে আরো সামনে ঝুঁকে এলো সে ; চাপা গলায় বললো, মেয়েটা প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে। এবোরশন করার জন্য চাপ দিয়েছিলো রফিক। কিন্তু মেয়েটা কিছুতে রাজি হচ্ছে না। মাঝখান থেকে বড় বিপদে পড়ে গেছে রফিক। তাই আজ কদিন ধরে সে আমায় ধরে বসেছে। বলছে, আমার বেতন আরো বাড়িয়ে দেবে আর বিয়ের খরচপত্র সব ও নিজে বহন করবে। নঈম হাসলো। মাহমুদ নীরব। সারা দেহ তার পাথর হয়ে গেছে।

ওকে চুপ থাকতে দেখে নঈম আবার বললো, বন্ধু হিসেবে ওর দুঃসময়ে ওকে বাঁচানো উচিত সে কথা আমি বুঝি, কিন্তু— কিছু বলতে গিয়ে ইতস্তত করছিলো নঈম। সহসা উঠে দাঁড়ালো মাহমুদ।

ওকি চললে কোথায় ? বসো। নঈম অবাক চোখে তাকালো ওর দিকে। মাহমুদ মৃদু গলায় বললো, কাজ আছে, চলি এখন।

রফিকের সঙ্গে দেখা করবে না ?

না।

দ্রুতপায়ে বেরিয়ে আসছিলো মাহমুদ। পেছনে রফিকের উচ্ছ্বাস-ভরা কণ্ঠস্বর শুনে থমকে দাঁড়ালো সে। আরে মাহমুদ যে, ওকি ! এসে চুপিচুপি আবার চলে যাচ্ছো ? মাহমুদকে পেয়ে অধীনস্থ কর্মচারীদের উপস্থিতি যেন ভুলে গেছে সে। এগিয়ে এসে ওর একখানা হাত চেপে ধরে বললো, এসো তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার চেম্বারে, এসো।

মাহমুদ বললো, না, আমার কাজ আছে, যাই এখন।

কাজ, কাজ আর কাজ। কাজ কি শুধু তোমার একার। আমি বেকার নই। আমারও কাজ আছে এসো, একটু বসে যাবে। মাহমুদকে সঙ্গে নিয়ে চেম্বারে ফিরে আসার পথে আড়চোখে একবার নঈমের দিকে তাকালো রফিক। লম্বা খাতাটার ওপর ঝুঁকে পড়ে গভীর মনোযোগ সহকারে হিসেব মিলাচ্ছে।

সোনালি রঙের কেস থেকে একটা সিগারেট বের করে দু-ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিলো রফিক, আরেকটা সিগারেট মাহমুদকে দিলো, তারপর বললো, তোমরা আসো না। এলে

কত ভালো লাগে সে আর কী বলবো। এই সারাদিন ব্যস্ত থাকি। যখন একটু অবকাশ পাই তখন তোমাদের কাছে পাইনে। কেমন আছো বলো। বউ আর মেয়ে ভালো আছে তো ? কলিংবেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকলো সে। দু-কাপ চা আনার ফরমায়েশ দিলো। তারপর আবার বলতে লাগলো, খোদাবক্সের দোকানে আজকাল যাও না ? আমি যাই না অনেকদিন হলো। সেদিন পাশ দিয়ে আসছিলাম। দেখলাম বেশ চলেছে ওর রেস্তোরাঁ। আজকাল রেকর্ডে সারাদিন ধরে হিন্দিগান বাজায় সে। দেয়ালে অনেকগুলো ফিল্মস্টারের ছবি ঝুলিয়ে রেখেছে। দেখলাম কুল্লিদের ভিড়, বেশ চলছে তাই না ? একটানা কথা বলে গেলেও মাহমুদ লক্ষ করলো অবচেতন মনে কী যেন ভাবছে রফিক।

চা খেয়ে আরেকটা সিগারেট ধরালো সে। চেয়ারে হেলান দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, নঈমের আমি একটা বিয়ে দিতে চাই, দিন দিন ও বড় খেয়ালি হয়ে যাচ্ছে, ওর সংসারী হওয়া উচিত। আড়চোখে একবার মাহমুদের দিকে তাকালো সে।

মাহমুদ বললো, তুমি নিজে কি চিরকুমার থাকবে নাকি ?

না, না মোটেই না। সামনে এগিয়ে এসে টেবিলের ওপর দু-হাতের কনুই রেখে পরক্ষণে জবাব দিলো, তবে হ্যাঁ, আপাতত ও-ধরনের কোনো প্ল্যান নেই আমার। সময় কোথায় বলো, সময় থাকলে তবু চিন্তা করা যেতো।

মাহমুদ হাসলো। রফিক ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সহসা বললো, নঈমকে তুমি একটু বোঝাতে পারো ? তোমার কথা সে নিশ্চয় শুনবে। ওর জন্যে ভালো একটা মেয়ে ঠিক করেছি আমি। কিন্তু, ও রাজি হচ্ছে না। বললাম সব খরচা আমার তবু—

আরো কী যেন বলতে যাচ্ছিলো সে, মাহমুদ মাঝখানে বাধা দিয়ে বললো, ওর জন্যে অত মাথা ঘামিয়ে তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করা কি উচিত হচ্ছে ? বলে উঠে দাঁড়ালো মাহমুদ। চলি আজ।

আরে শোনো দাঁড়াও। রফিক পেছন থেকে ডাকলো। কী জন্যে এসেছিলে কিছু বললে না তো ?

এমনি। বলে দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে এলো সে। পাখার নিচে বসেও এতক্ষণে রীতিমতো ঘেমে উঠেছে মাহমুদ।

মিতার জন্মদিনে বড় রকমের কোনো আয়োজন করেনি ওরা। কিছু প্যাস্ট্রি, ডালমুট আর কলা। এককাপ চা সকলের জন্যে।

বিকেলে আমন্ত্রিত অতিথিরা একে-একে এলো। মনসুর আর সেলিনা। তসলিম আর নঈম। ছোট ঘরে বেশি লোককে বসাবার জায়গা নেই। তাই অনেককে বলতে পারেনি ওরা। তবু ছোটখাটো আয়োজনটা বেশ জমে উঠলো অল্পক্ষণে।

মিতাকে আগে থেকে সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছিলো লিলি। কোলে নিয়ে সবাই আদর করলো তাকে।

সেলিনা বললো, দেখতে ঠিক মায়ের মতো হয়েছে।

মনসুর বললো, রঙটা পেয়েছে বাবার।

লিলি বললো, মেয়ে হয়ে বিপদ হলো, ছেলে হলে তোমাদের জামাই বানাতাম।

সেলিনা বললো, আমার কিন্তু ছেলে হবে, দেখো লিলি আপা।

মনসুর বললো, আমি কিন্তু মেয়ে চাই।

সেলিনা ঠোঁট বাঁকিয়ে বললো, তুমি চাইলেই হলো নাকি ?

হয়েছে মান-অভিমানের পালাটা তোমরা বাসায় গিয়ে করো লিলি হেসে বললো। এখন সবাই মিলে মিতার স্বাস্থ্য পান করবে এসো। মেয়েকে মাহমুদের কোলে বাড়িয়ে দিয়ে, খাবারগুলো এনে টেবিলে সাজিয়ে রাখলো লিলি।

সবার অনুরোধে নঈম একটা গান গেয়ে শোনালো ওদের।

তারপর খাওয়ার পালা।

প্যাস্ট্রি। ডালমুট। কলা। সর্বশেষে চা।

তসলিমের দিকে চায়ের কাপটা বাড়িয়ে দিয়ে লিলি মৃদু হেসে বললো, তুমি একা এলে, রাণুকে আনলে না যে ?

তসলিম লজ্জা পেয়ে বললো, আসার কথা ছিলো। কিন্তু বাসা থেকে বেরুতে পারেনি ও।

লিলি মুখ টিপে আবার হাসলো— ওর বাবা-মা বুঝি ওকে নজরে রেখেছে আজকাল ?

তসলিম দ্রুত ঘাড় নাড়িয়ে বললো, হ্যাঁ।

মনসুর চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, বিয়ের দিন-তারিখ কি এখনো ঠিক হয়নি ?

না, এখনো কথাবার্তা চলছে। মৃদু গলায় জবাব দিলো তসলিম। লিলি আবার ঠোঁট টিপে হেসে বললো, বেচারা বড় অস্থির হয়ে পড়েছে। তসলিম লজ্জায় লাল হয়ে গিয়ে বললো, হু তোমাকে বলেছে আর কী। শুধু শুধু বাজে কথা বলো।

চা-নাস্তা শেষ হলে আরো অনেকক্ষণ গল্প করলো ওরা। সিনেমা নিয়ে আলোচনা করলো। পত্র-পত্রিকা আর রাজনীতি নিয়ে তর্কবিতর্ক হলো। তারপর একে-একে বিদায় নিয়ে চলে গেলো সবাই।

মিতাকে কোলে নিয়ে আদর করেছিলো মাহমুদ। লিলি বললো, তোমার কী হয়েছে বলোতো, সবাই এত কথা বললো, তুমি একটা কথাও বললে না ?

মাহমুদ হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টেনে নিয়ে বললো, তুমিতো জানো লিলি, অতিরিক্ত হুল্লোড় ভালো লাগে না আমার।

তাই বলে বুঝি একটা কথাও বলতে হবে না ? কপট অভিমান করে লিলি বললো, ওরা কী মনে করলো বলোতো ?

কেন, তুমিতো কথা বলেছো সবার সাথে। মাহমুদ জবাব দিলো মৃদু গলায়। মিতা ঘুমিয়ে পড়েছে কোলে।

লিলি বিছানায় নিয়ে শোয়ালো তাকে। কপালে একটা চুমু খেয়ে আদর করলো। গায়ের কাপড়টা মিতার আস্তে করে টেনে দিলো সে। টেবিলের ওপর সাজিয়ে-রাখা হয়েছে সার-সার বই। মাহমুদ বইগুলো উলটে খোঁজ করছিলো খাতাটা। হঠাৎ একটা বই থেকে কী যেন পড়ে গেলো মাটিতে। উপুড় হয়ে ওটা হাতে নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো লিলি।

মাহমুদ বললো, কী ওটা ? বলতে বলতে লিলির পেছনে এসে দাঁড়ালো সে। লিলির হাতে একখানা ফটো। গ্রুপ ফটো। হাসমত আলী, মাহমুদ, সালেহা বিবি, মরিয়ম, হাসিনা সকলে আছে। তসলিম তুলেছিলো ওটা, আজো মনে আছে মাহমুদের।

ফটোর দিকে চেয়ে মৃদু গলায় লিলি জিজ্ঞেস করলো, ক–বছর হলো ?

মাহমুদ ওর কাঁধে হাতজোড়া রেখে বললো, পাঁচ বছর।

পাঁচটা বছর চলে গেছে, তাই না ? লিলির দৃষ্টি তখনো হাতে ধরে-রাখা ফটোটার ওপর। ধীরেধীরে মাহমুদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর মুখে চোখ তুলে তাকালো লিলি। চোখজোড়া পানিতে টলমল করছে ওর।

দুজনে মৌন।

দুজনে নীরব।

মাহমুদের গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো লিলি। বুকটা কী অস্বাভাবিকভাবে কাঁপছে ওর। অসহায়ের মতো কাঁপছে।

ওর ঘন কালো চুলগুলোর ভেতর সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে মাহমুদ মৃদু গলায় বললো, কেন কাঁদছো লিলি। জীবনটা কি কারো অপেক্ষায় বসে থাকে ? আমাদেরও একদিন মরতে হবে। তখনো পৃথিবী এমনি চলবে। তার চলা বন্ধ হবে না কোনোদিন। যে–শক্তি জীবনকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে, তার কি কোনো শেষ আছে লিলি ?